দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

যুদ্ধপরাধী জামাত এখন আওয়ামি লিগের হাত ধরেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে
— পৃঃ ১৬

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি না কল্পিত নায়ক?
— পৃঃ ২০

৬৯ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ৭ আগস্ট ২০১৭।। ২১ শ্রাবণ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ২১ শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৭ আগস্ট - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-১০

খোলা চিঠি : রাষ্ট্রপতি ভবনে কে বাবা রামনাথ! জবাবটা কান খাড়া করে শুনুন দিদি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

বিরোধী জোটের কোনো ভবিষ্যৎ নেই ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১২

অসমে ডিটেনশন ক্যাম্পের নাম করে জেলে বন্দি করে রাখা হচ্ছে ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৪

যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এখন আওয়ামি লিগের হাত ধরেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ▯ ১৬

২৪ নভেম্বর, ১৯২৬ শ্রীকৃষ্ণ এলেন পণ্ডিচেরী আশ্রমে ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি না কল্পিত নায়ক? ▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ২০

নীতীশ শুধু বিহার নয়, সারা দেশের রাজনীতির গতিবিধিই পাল্টে দিলেন ▯ নীরজা চৌধুরী ▯ ২৭

পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ▯ এস কে বাসু ▯ ৩০

শ্রীঅরবিন্দ ও ভারতের পুনর্জাগরণ ▯ গৌতম দত্ত ▯ ৩১

ত্রিগ্রাংচুর ভূয়োদর্শন ▯ সাধ না মিটিল আশা না পুরিল ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯** ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৭** ▯ **অন্যরকম : ৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা-শব্দরূপ : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষ

১৫ আগস্ট— স্বাধীনতার সত্তর বছর পূর্তি

স্বস্তিকা আগামী সংখ্যায় ৭০ বছরে পদার্পণ করছে। একই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার এবার সত্তর বছর পূর্তি। গত সাত দশকে আমাদের দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে ফিরে দেখাই আগামী সংখ্যার উদ্দেশ্য। পর্যালোচনা করেছেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলি, বিমল প্রামাণিক, ড. জিষ্ণু বসু, সাধন পাল, ধর্মানন্দ দেব, শচীন্দ্রনাথ সিংহ, প্রণয় রায় প্রমুখ।

সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটির জন্য সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— ১০ টাকা মাত্র।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

রাজ্যসভার আসন্ন নির্বাচন

প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গেও ইহার প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। বস্তুত বিহারে নীতীশের জোটসঙ্গী হিসাবে বিজেপি সরকার গঠনের পর হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বিজেপির আধিপত্য প্রায় সম্পূর্ণ। ব্যতিক্রম কেবল হিমাচল প্রদেশ। আসন্ন নির্বাচনে সম্ভবত যাহা বিজেপির দখলে যাইবে। ইতিমধ্যেই সমগ্র পশ্চিমভারত বিজেপি শাসনাধীন। বিহারে নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সমর্থন করিয়া প্রধানমন্ত্রী মোদী এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়াছেন। বিহারকে যেমন গেরুয়া মানচিত্রে লইয়া আসিয়াছেন, অন্যদিকে জেডিইউ-র ১০ জন রাজ্যসভা সাংসদকেও পাশে পাইয়াছেন। ইহাতে রাজ্যসভায় বিজেপি এনডিএ জোটের শক্তি এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়াইয়া লইতে সফল হইল। বিহার অপারেশনের পরই গুজরাটে কংগ্রেসের ঘরে রীতিমতো কম্পন ধরাইয়াছে বিজেপি। কেননা গুজরাটে কংগ্রেসের ৫৭ জন বিধায়কের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭ জন বিধায়ক হাতছাড়া হইয়াছে। কংগ্রেসের আতঙ্ক এতটাই যে গুজরাটের নিজেদের ৪৪ জন বিধায়ককে বিশেষ বিমানে লইয়া গিয়া কর্ণাটকের গোপন গেস্ট হাউসে রাখা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে ২০১৯ সালে ক্ষমতায় আসিবার আগেই বিজেপি রাজ্যসভার গরিষ্ঠতার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে চাহিতেছে। যত বেশি সংখ্যক রাজ্য নিজেদের সঙ্গে আসিবে ততই রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা বাড়িবে, ইহা সহজ অঙ্ক।

পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ভোটের ক্রসভোটিংয়ের প্রবণতাকে 'লিটমাস টেস্ট' বলিয়া মনে করিতেছে তাহা অসঙ্গত নয়। বিশেষত রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরানো সঙ্গী কংগ্রেসকে যেভাবে নিজেদের দিকে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। মমতা কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়াই রাজ্যসভার সাংসদ পদে রাজ্য কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্যকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই সমর্থনকে আমল দেওয়া হয় নাই। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী বিষয়টিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহানুভবতা বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। বরং ষষ্ঠ আসনে জিতিবেন না বলিয়াই সমর্থনের নামে একটি রাজনৈতিক চাল ছাড়া কিছু নয়। তাঁহার ব্যঙ্গোক্তি-সহ অভিযোগ—এত দরদ থাকিলে কংগ্রেসকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? ২০০৯-এর লোকসভা এবং ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে জোটসঙ্গী করিয়াই তৃণমূল নির্বাচনে লড়াই করিয়াছিল এবং বিপুলভাবে জয়লাভও করিয়াছিল। কিন্তু ২০১৪-তে এই জোট ভাঙ্গিয়া যায়। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন হইতে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করিয়া ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। অকস্মাৎ বামফ্রন্ট রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম ঘোষণা করায় এবং অন্যদিকে তৃণমূল নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে সমর্থন করায় রাজ্য-রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণ লক্ষ্য করা যাইতেছে। মমতা এক ঢিলে দুইটি পাখি মারিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকিবার এবং অন্যদিকে রাজ্যে বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট ভাঙ্গিয়া দেওয়া। রাজ্যসভার আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্য-রাজনীতির এই নূতন সমীকরণ কতদিন থাকিবে তাহাই এখন দেখার।

সুভাষিতম্

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। (গীতা ২/৫৬)

দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

সাত পুরসভার ভোটে ফের গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আরও একদফা পুরসভার ভোট। গণতন্ত্রের উৎসব আবারও গণতন্ত্রের প্রহসনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। আগামী ১৩ আগস্ট রাজ্যের সাতটি পুরসভায় ভোট, ফল বেরোবে ১৭ আগস্ট। পুরনির্বাচনের আওতায় পড়ছে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৩টি ওয়ার্ড, দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের ১৪টি, জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে ১৬টি, পশ্চিম মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার ১৮টি, হলদিয়ার ২৯টি, নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্পের ১২টি এবং বীরভূমের নলহাটি পৌরসভার ১৬টি ওয়ার্ড। এছাড়াও হুগলির চাঁপদানি পুরসভার ২টি এবং ঝাড়গ্রাম পুরসভার ১টি আসনে পুনর্নির্বাচন হবে ওইদিন। গত ২৪ জুলাই ছিল মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন, আর ২৭ জুলাই ছিল মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন।

এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে পাঁশকুড়া পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২টিতে তৃণমূল প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। ৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে যথাক্রমে দুই তৃণমূল প্রার্থী আনিসুর রহমান ও সমীরুদ্দিন জিতে গিয়েছেন। দু'টি ওয়ার্ডেই সিপিএম প্রার্থী ও ৪ নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তৃণমূল জমানায় মানুষ যে ধরনের নির্বাচন রীতিতে অভ্যস্ত তা হলো ভোটের আগে অশান্তি, রক্তপাত, ভয় দেখিয়ে বিরোধী দলের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার, তারপরেও যে বিরোধীরা অটুট থাকেন, ভোটের দিন তাদের শায়েস্তা করা, শত অত্যাচারেও যাদের কাবু করা গেল না, এমন জয়ী বিরোধীদের ভোট মিটমাটে ভীতি-প্রলোভন দেখিয়ে তৃণমূলের শিবিরে ভিড়িয়ে দেওয়া।

গণতন্ত্রের প্রহসন বাম আমলেও রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। বৈজ্ঞানিক রিগিংয়ের অভিযোগ তো তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতাই করেছেন। বিরোধী দলে সবসময়ই নিজেদের কিছু এজেন্ট রাখতো সিপিএম, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের ধারা মেনেই। মমতা এঁদের তরমুজ বলতেন। কিন্তু বিরোধী দলের দু-একজন জয়ী প্রার্থীও রাতারাতি ভোল বদলে শাসকদলে নাম ভিড়িয়ে দিচ্ছে, গণতন্ত্রকে এমন কালিমালিপ্ত করার ক্ষমতা বাম আমলেও শাসকদলের হয়নি। যা হচ্ছে হাল আমলে। বিশেষ করে আগামী এক বছরেরও মধ্যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে সাত পুরসভার এই নির্বাচন রাজ্যের শাসকদলের কাছে অ্যাসিড টেস্ট। সুতরাং সময় যত বাড়বে, চাপ আরও তৈরি হবে বলে আশঙ্কা করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

তাঁরা মনে করছেন কেন্দ্র-রাজ্য পরিস্থিতিও কিছু নতুন সমীকরণ সৃষ্টি করেছে। যেমন তৃণমূলিরা বেছে বেছে আক্রমণ করছে বিজেপি কর্মীদের। সূত্রের খবর, তৃণমূলের ওপরতলা থেকে নির্দেশ গিয়েছে কংগ্রেস কর্মীদের 'বুঝিয়ে সুজিয়ে' রাজ্যের 'সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি' গুরুতর একথা মাথায় ঢুকিয়ে তৃণমূলের দিকে আনতে হবে। কারণ মমতা খুব ভালো করেই জানেন দিল্লি কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি যতই আঁতাত করুন না কেন, এ রাজ্যের কংগ্রেসিরা তাঁকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আবার দিল্লির লোকেরা রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীদের পোছে না। মমতা দিল্লিকে হাতে রাখার পাশাপাশি, এ রাজ্যের নীচুতলার কর্মীদের সখ্য চাইছে। সম্ভব হলে দলে ভেড়ানো, কিন্তু তা না হলেও এদের ওপর অত্যাচার করা যাবে না বলে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ নীচুস্তরে পৌঁছে গিয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রদীপ ভট্টাচার্যকে আগ বাড়িয়ে সমর্থনের ঘোষণা, এ রাজ্যের কংগ্রেসিদের একাংশ মূলত অধীর-বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাদের পাশে পাওয়ার জন্য মমতার কৌশল বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

বামেদের মমতা নানাভাবে নানা জায়গায় হিতোপদেশ শুনিয়েছেন, ধমকেছেন বকেছেন— কেন তাঁরা দল ধরে রাখতে পারছেন না? কেন তাঁদের কর্মীরা 'সাম্প্রদায়িক বিজেপি'র সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন? ইত্যাদি। কিন্তু মমতার জন্য আরও দুঃসংবাদ হলো ভাঙনের কু-প্রভাব এবার খোদ বামফ্রন্টেই। ডি এস পি ফ্রন্ট ছেড়েছে, শোনা যাচ্ছে, নীতীশ কুমারের দলে মিশে এরা এনডিএ-র আওতায় এসে যাবে। এত বড় নীতিভ্রষ্টতা মানা যায়! কিন্তু মমতার জন্য নিকটতম যে দুঃসাংবাদটি অপেক্ষা করছে, তা হলো দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে দুই বাম শরিক আর এস পি এবং এস ইউ সি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। এখানকার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাম মনোনীত এস ইউ সি প্রার্থী শ্যামাপদ ঘোষ। এখানেই প্রার্থী হয়েছেন আর এসপি-র তুষারকান্তি ভট্টাচার্য। তিনি এই ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের দুবারের কাউন্সিলর। কিছুদিন আগে তৃণমূলে গিয়েছিলেন। পাত্তা না পেয়ে আবার আর এস পিতেই ভিড়েছেন।

এমনিতে দুর্গাপুরে আর এস পি-কে নিয়ে বামফ্রন্টের বড়ো শরিক সিপিএমের সমস্যা প্রবল। আর এস পি-র শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু ডিভিসির ডিটিপিএস তাপবিদ্যুৎ

কেন্দ্রের লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পারেনি। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের আন্দোলনের ব্যাপারে আর এস পি-র শ্রমিক সংগঠন সহমর্মীও বটে। ফলে সিপিএমের উস্কানিতেই আর এস পি-র দুবারের জেতা আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এস ইউ সি দাঁড়াল বলে মনে করা হচ্ছে। এমনিতেই বড়ো শরিক সিপিএমের ওপর ক্ষোভ উগরে বাকি শরিকদের কর্মীরা দল ছাড়ছেন, যা নিয়ে মাথাব্যথা সিপিএমের থেকেও বেশি মমতার।

কারণ তিনি বুঝে গিয়েছেন কংগ্রেস ম্যানেজেবল, সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সাইনবোর্ড হওয়ার মুখে। তাঁর এক এবং একমাত্র প্রবল প্রতিপক্ষ এখন বাংলায় একটি দলই রয়েছে। সেটি হলো বিজেপি। তাই মমতা এই পুরনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপিকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্পে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বরাবরই ভালো। মূলত শরণার্থী প্রবণ এই এলাকার মানুষেরও বিজেপির ওপর অনেক আশা ভরসা। তাই কুপার্সে বিজেপি কর্মীদের ওপর শুরু হয়েছে অকথ্য অত্যাচার। কুপার্সের একটি মণ্ডলের সভাপতি তথা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী লিটন বিশ্বাসের মোবাইল দোকানে হামলা চালায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা কর্মকার তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। কুপার্সে ১২টি আসনেই মনোনয়ন জমা দিয়েছিল বিজেপি। সিপিএম তথা বামফ্রন্ট দশটি ও কংগ্রেস একটি আসনে। তৃণমূলের অত্যাচারে এখানকার বহু বিজেপি কর্মী এলাকাছাড়া, নিখোঁজ। এরকম সন্ত্রাসের পরিবেশে আগে কখনও ভোট দেখেছেন বলে মনে করতে পারছেন না কুপার্সবাসী।

কুপার্স ছাড়া বিজেপি বীরভূমের নলহাটি ও হলদিয়ায় তৃণমূলকে কড়া চ্যালেঞ্জর মুখে ফেলেছে। নলহাটি পুরসভার ১৬টি আসনেই তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াই হচ্ছে। কংগ্রেস, সিপিএমের হাল এতই খারাপ যে জোট করেও প্রার্থী খুঁজে পায়নি। তৃণমূলের অবস্থাও তথৈবচ। ভাড়া করা বহিরাগত প্রার্থী এনে বিজেপি-র বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। তবে সন্ত্রাসে কমতি নেই। বিজেপির ভূমিপুত্রদের ঘরছাড়া করতে পুলিশ-প্রশাসনের মদতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তৃণমূলের বহিরাগত দুষ্কৃতীরা।

মনোনয়নপত্র পেশের সময়ও বাধা দেওয়া হয়েছে বিজেপি প্রার্থীদের। বিজেপির 'ডেডিকেটেড' কর্মীরাই আপাতত দলের বড় ভরসা। নলহাটির মণ্ডল দম্পতি সাধন-নীলা ও লেট দম্পতি সনৎ-কাতুবালা সমস্ত সন্ত্রাস তুচ্ছ করে ভোটের ময়দানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রার্থী হয়ে এগিয়ে এসেছেন। দলীয় কর্মীরা জানাচ্ছেন, তৃণমূলের বহিরাগতরা যতই সন্ত্রাস করছে ততই বিজেপির ভূমিপুত্রদের নেতৃত্বে এলাকাবাসী কোমর বাঁধছেন।

আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে হলদিয়াও। তৃণমূলের রমরমা বাজারেও, শেঠ পরিবারের ঘোর দুর্দিনেও হলদিয়া থেকে খালি হাতে একদা ফিরতে হয়েছিল মমতা ব্যানার্জির দলকে। লক্ষ্মণ শেঠের সাংগঠনিক দক্ষতায় হলদিয়ায় অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ বিজেপি।

সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর তাণ্ডব
কেরলে প্রচারক খুন, বিজেপির বনধে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সিপিএমের গুণ্ডাদের হাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক কার্যকর্তার খুন হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ভারতীয় জনতা পার্টি বনধ ডেকেছিল। কেরলের মানুষ তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন। ঘটনাটি সর্বভারতীয় মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় রাজ্যপাল পি. সদাশিবম রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে ডেকে পাঠান। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে রাজনৈতিক রঙ না দেখে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এখনও পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহও কেরলে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

গত ২৩ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা ই. রাজেশ (৩৪) একদল দুষ্কৃতীর হাতে খুন হন। অভিযোগ, এরা সকলেই সিপিএমের ঘনিষ্ঠ। এরই প্রতিবাদে বনধ ডাকে রাজ্য বিজেপি। কেরল পুলিশের প্রধান লোকনাথ বেহরা বলেন, 'ধৃত দুষ্কৃতীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে মৃত ই. রাজেশের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক শত্রুতা তো বটেই, সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতাও ছিল।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেরলে স্বয়ংসেবকদের ওপর সিপিএমের অত্যাচার নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এই প্রবণতা বিদ্যমান। সম্প্রতি সারা দেশে কংগ্রেসি রাজনীতিতে ভাটার টান এবং তার লেজুড় হিসেবে বামপন্থী দলগুলোর অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ার কারণে স্বয়ংসেবকদের ওপর সিপিএমের ক্যাডারদের আক্রোশ দিন-দিন বাড়ছে। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এক টুইটবার্তায় রাজনাথ সিংহ বলেন, 'কেরলে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হিংসা প্রসঙ্গে আমার উদ্বেগের কথা আমি রাজ্য সরকারকে জানিয়েছি। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক হিংসা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। আশা করব রাজনৈতিক হিংসা দমনে রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। দুষ্কৃতীদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে রাজনৈতিক রং দেখা হবে না।' ময়না তদন্তের পর ই. রাজেশের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অজস্র মানুষ স্বয়ংসেবকের শেষযাত্রায় অংশ নেন। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কোট্টায়াম জেলার পুথুপল্লিতে।

অবাধ ভোট হলে ধুপগুড়ি পুরসভায় বিজেপির জয়ের সম্ভাবনাই বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধুপগুড়ি পুরসভার বুক চিরে বেরিয়ে গেছে জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়কের পাশের কয়েকটি ওয়ার্ড বাদে ধুপগুড়ি পুরসভার যেখানেই যাবেন আপনার মনে হবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চলে এলাম না তো? ড্রেন, রাস্তা, পথবাতি, পানীয় জল সরবরাহের মতো ন্যূনতম পরিকাঠামোটুকু গড়েই উঠেনি। যাঁরা ভাগ্যবান একমাত্র তারাই পানীয় জলের হাউস কানেকশন পেয়েছেন। যতটুকু কাজ হয়েছে সেগুলিও অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে পথঘাট, পথবাতি সবই নির্মাণের কিছুদিন পরই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বাম আমল থেকে বর্তমান তৃণমূলের জমানা পর্যন্ত পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির ধারাবাহিকতা নিয়ে নানা

রসালো গল্প ধুপগুড়ির মানুষের মুখে মুখে। স্বাভাবিক ভাবেই দুর্নীতি, অনুন্নয়ন, ঠিকাদার রাজ, স্বজনপোষণ, দাদাগিরির পাঁকে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। সিপিএম ও তৃণমূলের বিকল্প বিজেপিকে নির্বাচনী ময়দানে নামার সময় ইস্যু নিয়ে ভাবতে হয়নি।

বিজেপি নেতা আশুন রায় ও কৃষ্ণপদ সরকার জানালেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে ধুপগুড়িকে দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ পুরসভা হিসেবে গড়ে তুলবে। এই ইস্যু নিয়েই দলের কর্মীরা মানুষের কাছে যাচ্ছে। বিজেপির নেতা কর্মীরা জানালেন সদ্য অনুষ্ঠিত দলের বিস্তারক যোজনার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি ও সেগুলি রূপায়ণে বর্তমান রাজ্য সরকারের অনীহা, কেন্দ্রের প্রকল্পকে রাজ্যের বলে চালানো, ধুপগুড়ি পুরসভায় প্রধানমন্ত্রী গৃহ যোজনা নিয়ে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের সীমাহীন দুর্নীতি এরকম নানাবিধ ইস্যু তুলে ধরে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এখন শুধু ধুপগুড়ি পুরসভায় নয় গোটা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে ক্ষমতায় দেখার জন্য মানুষ মুখিয়ে রয়েছেন।

কাজের মানুষ হিসেবে পরিচিত পরপর দুটি টার্মে জয়ী ধুপগুড়ি পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার কৃষ্ণদেব রায় জানালেন, তিনি বিরোধী দলের কাউন্সিলার হওয়ায় উন্নয়ন করতে গিয়ে পদে পদে বাধা পেয়েছেন। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য এই ওয়ার্ডের মানুষকে বঞ্চিত করেছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ চরমে। তিনি নিশ্চিত যে এবার আরো বেশি ভোটে জিতে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে হ্যাট্রিক করবেন।

পুরসভার বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো এবারের হাওয়া বিজেপির পক্ষেই। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা গেল লড়াইয়ের ময়দানে সিপিএম কোনও ফ্যাক্টর হবে না। গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষও তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যাকফুটে রাখবে একথাও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। অনেক মানুষ এটাও বলছেন অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন হলে বিজেপির জেতার সম্ভাবনাই বেশি। তৃণমূল কংগ্রেস কি ধুপগুড়িতে অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেবে এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন!

১৩ আগস্ট সাতটি পুরসভায় নির্বাচন

বিজেপি প্রার্থীদের ওপর তৃণমূল-গুণ্ডাদের জুলুম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হলদিয়া পুরসভার নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে করানোর দাবি তুলল প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডারা বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা দিচ্ছে।

সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশনার এ.কে. সিংহের সঙ্গে দেখা করে লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, 'আগামী ১৩ আগস্ট হলদিয়া পুরসভার নির্বাচনের জন্য বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করতে দিচ্ছে না তৃণমূলের গুণ্ডারা। ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরীর গাড়িও ভাঙচুর করেছে তৃণমূলের গুণ্ডারা।' বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারকে অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং আমাদের প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ জানিয়েছি।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগামী ১৩ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে সাতটি পুরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত। ফলফল জানা যাবে ১৭ আগস্ট। নির্বাচনমুখী পুরসভাগুলি হলো :

দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন— ৪৩ ওয়ার্ড
ধুপগুড়ি পুরসভা (জলপাইগুড়ি)—১৬ ওয়ার্ড
বুনিয়াদপুর পুরসভা (দক্ষিণ দিনাজপুর)— ১৪ ওয়ার্ড
পাঁশকুড়া পুরসভা (পূর্ব মেদিনীপুর)— ১৮ ওয়ার্ড
হলদিয়া পুরসভা (পূর্ব মেদিনীপুর)— ২৯ ওয়ার্ড
কুপার্স ক্যাম্প (নদীয়া)—১২ ওয়ার্ড
নলহাটি পুরসভা (বীরভূম)— ১৬ ওয়ার্ড

ভাবার বিমান দুর্ঘটনায় সি আই এ-র ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৬৬ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭০৭ বিমানের দুর্ঘটনায় কি মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ-র হাত ছিল? এই বিমানে ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানী ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবা একটি বৈঠকে যোগ দিতে ভিয়েনা যাচ্ছিলেন। মাঝপথেই বিমানটি আল্পস পর্বতমালার মঁ ব্ল্যাঙ্ক শিখরের কাছে ভেঙে পড়ে। ২০০৮ সালের ১১ জুলাই প্রচারিত সাংবাদিক গ্রেগরি ডগলাসের নেওয়া সি আই এ আধিকারিক রবার্ট ক্রাউলের একটি সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত করে টিবিআর নিউজ নামের একটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম উসকে দিয়েছে সংশয়টি। তাদের প্রকাশিত ভিডিয়ো টেপে ক্রাউলে হোমি জাহাঙ্গির ভাবাকে 'বিপজ্জনক' আখ্যা দেন। কারণ তিনি 'পরমাণু বোমা বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন।' সেই কারণেই, সিআইএ-র হেডকোয়ার্টের নির্দেশে, 'বিমানের মাল রাখার জায়গায় শক্তিশালী বোম রাখা হয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণের ফলেই বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে।'

উবাচ

"অন্য কারোর প্রধানমন্ত্রী হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ২০১৯-এ নরেন্দ্র মোদীকে হারানোর মতো কাউকে দেখছি না।"

নীতীশকুমার
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী জোটের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে

"যখন কোনও গরিব মানুষ আমায় চিঠি লিখে জানান যে দেশে জিএসটি চালু হওয়ার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমেছে এবং তিনি তাতে উপকৃত হয়েছেন, আমার তখন গর্ব হয়।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর জিএসটি-র প্রভাব প্রসঙ্গে

"আমাদের লক্ষ্য গুজরাটের বন্যাদুর্গত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। কংগ্রেস নেতারা ফাইভ স্টার রিসর্টে বসে আরাম করুন, আমাদের কাজ আমরা ঠিকই করব।"

বিজয় রুপানি
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী

দলের ভাঙন রুখতে কংগ্রেস বিধায়কদের রিসর্টে অজ্ঞাতবাস প্রসঙ্গে

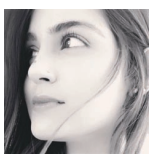

"আপনি যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হতেন তা হলে পাকিস্তান নামের দেশটাই বদলে যেত।...আপনাকে কী বলব সুষমাজী—মহামানবী? দেবী? যাই বলি না কেন আপনার উদারতার তল পাওয়া মুশকিল।"

হিজাব আসিফ
পাকিস্তানের নাগরিক

পাকিস্তানি নাগরিকদের মেডিকেল ভিসা দেওয়ার প্রসঙ্গে

"লোক মারা যাচ্ছে, অনশন করছে, বিক্ষোভ চলছে তো চলছেই। পাহাড়ের অবস্থা কাশ্মীরের থেকেও খারাপ। আমরা চাই কেন্দ্র এবার হস্তক্ষেপ করুক।"

বিমল গুরুং
গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা
প্রেসিডেন্ট

পাহাড়ের আন্দোলনে রাজ্য সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা প্রসঙ্গে

ফতোয়ার আতঙ্কে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন বিহারের জেডিইউ দলের মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিহার বিধানসভার অভ্যন্তরে নতুন মন্ত্রীসভা শপথ নেওয়ার পরই ফিরোজ আহমেদ অন্য সকলের সঙ্গে 'জয় শ্রীরাম' জয়ধ্বনি করেন। তাঁর এই কাজে মোল্লা মহল প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম অবমাননার দায়ে ফুলওয়াড়া শরিফের ইমরাত-এ-শারিয়ার মুফতি তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন। ফতোয়া মোতাবেক ফিরোজ আহমেদ ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। তাঁকে ধর্মচ্যুত করা হয়।

সেই সঙ্গে ফিরোজের বিয়েকেও অসিদ্ধ ঘোষণা করা হয় যতক্ষণ না তিনি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর ফিরোজ আর কালবিলম্ব না করে ফুলওয়াড়া শরিফের মুফতির কাছে ছুটে যান। জোট সরকারের ভারতীয় সংবিধানের সদ্য শপথ নেওয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের এই মন্ত্রী শারিয়া

আইনের ফতোয়ার দাপটে নিজের ভুল স্বীকার করে বিনাশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, 'তাঁর শ্রীরাম জয়ধ্বনি দেওয়ার ফলে কারোর মনে আঘাত লেগে থাকলে তিনি তাঁর কথা ফিরিয়ে নিচ্ছেন।' এই সূত্রে ইমরাত এ শরিয়ার ফতোয়াবাজরা ফিরোজকে বলেন, ফতোয়ার ফলে তিনি তাঁর স্ত্রীর ওপর অধিকার হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকেও বিচ্যুত হয়েছেন। ফিরোজ এরপর মুফতির আদেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

এই মর্মে মুফতি সমগ্র মুসলমান সমাজকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কোনও মুসলমান সজ্ঞানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম সম্পর্কে প্রশংসাসূচক কোনও কথা উচ্চারণ করলেই তিনি আর মুসলমান সমাজের অংশ থাকবেন না, তাকে সমাজচ্যুত করা হবে। কেবলমাত্র বিনাশর্তে ক্ষমার পরই তার প্রত্যাবর্তন বিবেচিত হতে পারে। অবাক হয়ে ভাবতে হয় এটি কোন দেশ, এটি কোন শতাব্দী!

পরিবারতন্ত্রের সমর্থনে উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী গোপালকৃষ্ণকে তীব্র ভর্ৎসনা ভাগ্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গোপালকৃষ্ণ গান্ধী যিনি কংগ্রেস সমর্থিত বিরোধী প্রার্থী হিসেবে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সরাসরি এর বিরোধিতায় নামলেন তাঁর নিজের ভাগ্নে শ্রীকৃষ্ণ কুলকার্নি। বাঙ্গালোরবাসী পেশায় রোবোটিক ইঞ্জিনিয়ার ও স্বনিযুক্ত উদ্যোগপতি শ্রী কুলকার্নি মহাত্মা গান্ধীর পুত্র রামদাস গান্ধীর নাতি ও গোপালকৃষ্ণের খুড়তুতো বোন সুমিত্রা কুলকার্নির পুত্র। তীব্র বিষোদ্গার করে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, অতীতে মতিলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। তার পর থেকে জওহরলাল, ইন্দিরা রাজীব

হয়ে রাহুল গান্ধীকে নিয়ে কংগ্রেস দল আজ পঞ্চম প্রজন্মের কংগ্রেসি পরিবারতন্ত্রের কুক্ষিগত। কৃষ্ণ আরও বলেন যে, এই পরিবারের বজ্র আঁটুনি যতই কংগ্রেসের ওপর চেপে বসেছে ততই ভারতীয় রাজনীতির গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটটি ধ্বংসের মুখে পড়েছে। কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে (১৯৯৮ থেকে) একই গদি আঁকড়ে রয়েছেন। এরপর যাতে তাঁর ছেলে ওই পদে যেতে পারে তাও সুনিশ্চিত করেছেন। সরাসরি গোপাল গান্ধীকে লেখা চিঠিতে হতাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন— মনোনয়ন দাখিলের সময় তাঁর দুই পাশে পরিবারতন্ত্রের দুই প্রভিভূকে দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন। তাঁর মনে হয়েছে সেই মুহূর্তেই মহাত্মা গান্ধী বা ভীমরাও আমবেদকরের অনুসৃত যে নীতিগুলিকে গোপালবাবু এতদিন মেনে এসেছেন সেগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ পদদলিত করলেন। এঁরা দু'জনেই জন্মসূত্রে কোনও ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই মর্মে বিগত বহু বছর ধরে কংগ্রেসি শাসন চলাকালীন যে অসংখ্য দুর্নীতিতে দল লিপ্ত হয়েছে সে সম্পর্কে গোপাল গান্ধীর কাছ থেকে কখনও কোনও প্রতিবাদী উচ্চারণ শোনা যায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পরিবারের সমর্থন নিয়ে প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে কুলকার্নি বলেন, বৃহৎ গান্ধী পরিবারের একজন নগণ্য সদস্য হিসেবে তিনি তাঁর বিরোধিতাকে এভাবেই সর্বসমক্ষে কর্তব্য হিসেবে নথিভুক্ত করাতে চান।

রাষ্ট্রপতি ভবনে কে বাবা রামনাথ! জবাবটা কান খাড়া করে শুনুন দিদি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
দিদি,

আপনি প্রশ্ন করেছিলেন, কে এই রামনাথ? উত্তর তো পেয়ে গিয়েছেন। সাধারণ জ্ঞান বই খুলে দেখুন— ভারতের রাষ্ট্রপতি। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সাংবিধানিক প্রধান। শিখুন, দিদি শিখুন। বিজেপিকে দেখে শিখুন। কী করে শীর্ষ বিজয় করতে হয় দেখুন। এ দল ও দল অনেক করেছেন, গান্ধী পরিবারের অনেক পদলেহন করেছেন, জনপথবাসিনীকে অনেক তৈলমর্দন করেছেন কিন্তু বোঝেননি যে গেরুয়া ঝড় থামানো তাঁর কম্ম নয়। কারওরই কম্ম নয়। গোটা দেশটার রং-ই যে এখন গেরুয়া।

রাষ্ট্রপতি ভবন তবে তেমনটা হবে না। যোগ্য নেতৃত্ব এমন মানুষকে বাছতে জানে যাঁর বিরুদ্ধে কাদা ছোঁটানো যায় না। রামনাথ কোবিন্দ একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এটা সত্যি। প্রচারের আলোয় ছিলেন না, এটাও সত্যি। কিন্তু এমন এক আদর্শের সঙ্গে ছিলেন যা সত্যি সত্যিই শ্রেষ্ঠ আসন দখল করতে পারে। তার জন্য কোনো নীতিগত অবস্থান বদলাতে হয় না। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা দেখিয়ে দিয়েছেন শুধু আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকলে সম্ভব। সব সম্ভব।

সত্যই তো বিজেপির স্বপ্নের দিন এল। অবশেষে 'শীর্ষ বিজয়' করল বিজেপি। এই প্রথম বার দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হলেন একজন বিজেপি নেতা। ভারতের ১৪তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন রামনাথ কোবিন্দ। শপথগ্রহণ করে তিনি বলেন, ''মাটির ঘর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। সেখান থেকে এই যাত্রাটা দীর্ঘ। আমি বিনম্রভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। এই দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব।''

দেখুন দিদি একটি আদর্শ নিয়ে যদি নিরলস সাধনা করা যায় তবেই এটা সম্ভব। যেটা বিজেপি করে দেখিয়েছে। আজ জেনে নিন কোবিন্দ কে। রামনাথ কোবিন্দ আসলে একটি আদর্শের সাধক। আপনার কেনাবেচার মন নিয়ে বিষয়টা বুঝতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে বোঝার চেষ্টা করুন। রামনাথ কোবিন্দের শীর্ষ পদে আসীন হওয়াটা আসলে একটা আদর্শের শীর্ষ-দখল। সেই একটি কথা নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মোদী আসলে একটি আদর্শের প্রতিনিধি।

তৃণমূল কংগ্রেসের পাপের যে অন্ত নেই তা আপনি ভালো করেই জানেন দিদি। তবু স্মরণ করিয়ে দিই যে নীতিহীন, গায়ের জোরের রাজনীতি আপনারা করছেন তা কিন্তু খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। নরেন্দ্র মোদী, রামনাথ কোবিন্দের আদর্শ বলছে, এই ভারতে দুর্নীতির জায়গা নেই। সবাই আপনাকে ছেড়ে যাবে। নীতীশ কুমার আপনাকে, আপনাদের ছেড়ে গেছেন। কেউ থাকবে না। জনগণও নয়। মা-মাটি- মানুষের নামে আপনি যে লোভ-তোষণ-দাদাগিরির রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেন তার আয়ু কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে।

নীতীশের পদত্যাগের পরে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ''দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া লড়াইয়ে যোগদানের জন্য নীতীশ কুমারজীকে অভিনন্দন। ১২৫ কোটি নাগরিক সততাকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং সমর্থন করছে।'' দেশবাসীর হয়ে দুর্নীতি ইস্যুতে নীতীশকে বাহবা দেওয়ার পরেই মোক্ষম ইঙ্গিতটি দেন মোদী। টুইটারে তিনি লেখেন, ''দেশ, বিশেষ করে বিহারের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক মতভেদের উপরে উঠে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এখন দেশ ও সময়ের চাহিদা।'' মোদী বর্ণিত এই চাহিদাই আপনাদের দুর্দিন ডেকে আনবে।

নরেন্দ্র মোদী যে ভাবে দুর্নীতি ইস্যুতে লড়াইয়ে নীতীশকে সৈনিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাতে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের উপরেও যথেষ্টই চাপ তৈরি হলো। আপনার দল, সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও নেতা বিভিন্ন দুর্নীতিকাণ্ডে অভিযুক্ত। চলছে তদন্ত। মোদীর দুর্নীতি বিরোধী নিরলস লড়াই জয় পাবেই। আদর্শের জয় হবেই।

কথায় কথায় আর এস এস, বিজেপির সমালোচনা বন্ধ করে আদর্শের এই জয়কে বিশ্লেষণ করুন। বোঝার চেষ্টা করুন। আর সদলবলে, সপরিবারে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করুন। কিন্তু আর নিরাপদে থাকা যাবে কি! মানুষের আবেগ আর আদর্শকে পদদলিত করার সাজা যে পেতেই হবে। এটা আমি নই, ইতিহাস বলছে। বেশি পুরনো নয়, ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস।

—সুন্দর মৌলিক

বিরোধী জোটের কোনো ভবিষ্যৎ নেই

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। মাত্র কুড়ি মাস লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে ঘর করেই নীতীশকুমার উপলব্ধি করেছেন— কী সর্বনাশ তাঁর হয়ে গিয়েছে। বহু পরিশ্রম করে, অতি যত্নে, নিজের যে পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক ভাবমূর্তিটি গড়ে তুলেছেন নীতীশ— লালুপ্রসাদের সংস্পর্শে এসে গত কুড়ি মাসে সেই ভাবমূর্তিতে যে একটু একটু করে কালির ছিটে লাগতে শুরু করেছিল— তা বুঝতে নীতীশের বিলম্ব হয়নি। আরো বেশ কিছুদিন লালুপ্রসাদের সঙ্গে ঘর করলে সযত্ন লালিত ভাবমূর্তিটি যে ভেঙে পড়তে বাধ্য— তা বুঝতেও নীতীশের দেরি হয়নি। অতএব, আর বিলম্ব না করে, লালুর সঙ্গ ত্যাগ করে নীতীশ ফিরে এসেছেন তাঁর পুরনো মিত্র বিজেপির কাছে। বিজেপিও নীতীশের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। আপাতত বিহারে বিজেপি এবং নীতীশের জোট সরকারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয়েছে। এর আগে নীতীশ ২০০৫-য় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে যোগ দিয়েছিলেন। ২০১৩-য়ে তিনি এনডিএ জোট ছাড়েন। গত বিধানসভা নির্বাচনে লালুপ্রসাদ এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেধে নির্বাচনে লড়েন নীতীশ। নীতীশের এনডিএ জোট ছাড়ার মূল কারণটি যত না আদর্শগত ছিল, তার থেকে বেশি ছিল ব্যক্তিগত। নীতীশ ভেবেছিলেন--- ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করবে। তা না করায়, ক্ষোভেই এনডিএ জোট ছাড়েন নীতীশ। সঙ্গ ত্যাগ করেন বিজেপির। এবং বিজেপিকে শিক্ষা দিতে লালুপ্রসাদ এবং কংগ্রেসের হাত ধরেন। কিন্তু দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত এক দাগি ব্যক্তির হাত ধরা যে তাঁর মারাত্মক ভুল— তা কুড়ি মাস আগে সরকার গড়ার পর থেকে বুঝতে পারছিলেন নীতীশ। বিহারে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার চালানোর সময় নীতীশ বিহারবাসীকে সুশাসন উপহার দিতে পেরেছিলেন। বিহারে উন্নয়নের জোয়ার আনতে চেয়েছিলেন। গুণ্ডাবাজি, তোলাবাজি, মাফিয়ারাজ বন্ধ করতে পেরেছিলেন বিহারে। কিন্তু গত কুড়ি মাসে লালুপ্রসাদের দয়ায় বিহার আবার ফিরে গিয়েছিল সেই অতীতের অন্ধকার দিনগুলিতে। ফিরে এসেছিল গুণ্ডাবাজি, তোলাবাজি, মাফিয়ারাজ। সামনে এসেছিল লালুপ্রসাদের পরিবারের অবাধ দুর্নীতি। উধাও হয়েছিল সুশাসন। বিহারবাসীর সৌভাগ্য এই যে, মাত্র কুড়ি মাসের ভিতর নীতীশের শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটেছে। আরো দেরি হলে, বিহারবাসীর কপালে আরো কী কী দুর্ভোগ ছিল কে জানে।

এখন প্রশ্ন, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব, বামপন্থীরা যে বিরোধী জোটের স্বপ্ন দেখছিলেন, তার কী হবে? বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের অগ্রগতিকে ঠেকাতে এই বিরোধী জোটের মূল উদ্যোক্তা কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সোনিয়ার একটি লক্ষ্য— যেন তেন প্রকারে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসা। তাঁর এই ক্ষমতায় ফিরে আসার বাসনার পথে ন্যায়-নীতি- আদর্শের কোনো বালাই নেই। সোনিয়া-পুত্র রাহুল গান্ধী, যিনি নিজেকে কৃষক দরদি বলে দাবি করে থাকেন--- তিনিও তাঁর রাজনৈতিক অভিধান থেকে নীতি-আদর্শ শব্দগুলি বাদ দিয়েছেন। এই লালুপ্রসাদ সম্পর্কে সোনিয়া-রাহুলের অবস্থান একটু ব্যাখ্যা করলেই, তাঁদের স্বার্থান্বেষী নীতিহীন রাজনীতির স্বরূপটি উন্মোচিত হবে। সুপ্রিম কোর্ট একটি রায়ে বলেছিল, কোনো সংসদ সদস্য বা বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিধায়ক বা সাংসদপদ খারিজ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সাজার মেয়াদ শেষ হলেও ছ' বছর তিনি কোনো নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলেই লালুপ্রসাদ এখনও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন না। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার যখন ক্ষমতায়, তখন পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় দোষী সাব্যস্ত লালুপ্রসাদ গিয়ে পড়েন সোনিয়া গান্ধীর পদতলে। লালুপ্রসাদের কাকুতি-মিনতিতে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কার্যকর করা ঠেকাতে মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন সরকারকে দিয়ে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করান ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া। তখনই বোঝা গিয়েছিল, ইতালির কন্যা সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক অভিধানে ন্যায়-নীতি-আদর্শের কোনো স্থান নেই।

কিন্তু সোনিয়া পুত্র রাহুল? কী করছিলেন তিনি? লালুপ্রসাদের মতো দাগি আসামিদের বাঁচাতে মনমোহন সিংহের সরকার যখন এহেন একটি অর্ডিনান্স এনেছে— তখন নিজের 'বিপ্লবী' ইমেজ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন সোনিয়া-তনয়। ২০১৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল বলেছিলেন— 'যে অর্ডিনান্স জারি করেছে কেন্দ্র ওটা একেবারে ফালতু। ওটা এখনই ছিঁড়ে ফেলা উচিত।' বাজারে বেশ বাহবাও পেয়েছিলেন রাহুল। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। মনে করেছিলেন— এতে তাঁকে অসম্মান করা হয়েছে। যে কথাটি মনমোহন মুখ ফুটে বলতে পারেননি, তা হলো, এই অর্ডিনান্স জারি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কামিটির বৈঠকে। আর বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং সোনিয়া গান্ধী। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে রাহুল গান্ধী অর্ডিনান্স ছিঁড়ে ফেলার কথা বলেছিলেন, মাত্র তিন বছরের মাথায়,

২০১৬ সালেই, সেই রাহুলই হাত ধরে ফেললেন লালুপ্রসাদের। প্রমাণ হয়ে গেল— সোনিয়া-তনয়ের কথায় এবং কাজে কোনো সামঞ্জস্য নেই। তিনি যা দেখান— সেটা আসলে ভান। এই ভণিতা সর্বস্ব স্বার্থান্বেষী রাজনীতিটিই কংগ্রেস অতীতেও করেছে, এখনও করছে এবং ভবিষ্যতেও (যদি এই দলটির অস্তিত্ব আদৌ থাকে) এই রাজনীতিই তারা করবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন—২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই বিরোধীরা 'গেল গেল' রব তুলেছে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ভারতের শাসন ক্ষমতায় বসার পৈতৃক অধিকারটি যেন একমাত্র তাদেরই ছিল। সে অধিকারটি নরেন্দ্র মোদী গায়ের জোরে ছিনিয়ে এনেছেন। কখনও আট দলের জোট, কখনও আঠারো দলের জোট— এরকম নানাবিধ বিরোধী জোটের কথা বলে চলেছেন তাঁরা। বিরোধী জোটের আর এক প্রধান প্রবক্তা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী তো আরো এক পা এগিয়ে বলে ফেললেন— 'বিজেপির অন্য যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হোন। শুধু নরেন্দ্র মোদীকে চাই না।' এই কথার ভিতর দিয়েই কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বিরোধী জোটের প্রবক্তাদের মূল উদ্দেশ্য। কোনো আদর্শগত লড়াই নয়, কোনো রাজনৈতিক লড়াই নয়, শুধু নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ—বিরোধী জোটের উদ্দেশ্য এটাই। কেন ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্র মোদী এই বিরোধী জোটের লক্ষ্যবস্তু? কেননা, ক্ষমতায় আসার পর গত তিন বছরে মোদী কামিয়ে খাওয়ার রাজনীতির মৌচাকে একটি বড় সড় ঢিল মেরে বসেছেন। গত কয়েক দশক ধরে যারা এদেশের রাজনীতিতে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসে কামিয়ে খাচ্ছিল, তাদের এখন রাজনৈতিক দোকান বন্ধ হওয়ার মুখে। প্রমাদ গুনেছে তারা। মোদী এবং বিজেপি আরো একবার ক্ষমতায় ফিরে এলে এদেশের রাজনীতিতে তাদের যে অস্তিত্বই থাকবে না— এটি বুঝতে এই কামানেওয়ালাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। অতএব, মোদী বিরোধিতায় কামিয়ে খাওয়াদের একটি সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে।

ইউপিএ জমানায় নানাবিধ দুর্নীতিতে ফেঁসে থাকা, ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারিতে গান্ধী পরিবারের নাম উঠে আসা, জমি কেলেঙ্কারিতে স্বয়ং সোনিয়া-জামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠা— এসবে বিপর্যস্ত কংগ্রেস নিজেদের পাপ ঢাকা দিতে মোদীর বিরুদ্ধে 'প্রতিহিংসা'র রাজনীতির অভিযোগ তুলছে। লালুপ্রসাদের মতো দাগি আসামির হাত ধরতেও দ্বিধা করছে না। জোটের আর এক প্রবক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস সারদা, নারদা, রোজভ্যালি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ছে। দলের সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রীদের হাত পেতে টাকা নেওয়ার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসব নিয়ে তদন্তও হচ্ছে। আর দলের অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের আড়াল করতে তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে 'প্রতিহিংসার তত্ত্বই খাড়া করছেন। চোর চুরি করলে তা নিয়ে তদন্ত হবেই। আর তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে তার সাজা হবেই। এর ভিতর 'প্রতিহিংসা' কোথায় খুঁজে পেলেন বিরোধী নেতা-নেত্রীরা তা বোঝা বড়ই দুষ্কর। আসলে গাত্রদাহটা অন্যত্র। আসলে চুরি করলেও তার কোনো তদন্ত হোত না। আর তদন্ত হলেও সাজা হোত না। বরং চোরকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য অর্ডিনান্স জারি করা হোত। এখন আর চুরি করে পালিয়ে যাবার উপায় নেই।

এহেন নীতিহীন স্বার্থসর্বস্ব বিরোধীরা কতটা জোট বাঁধতে পারবেন? বিরোধী জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা ইতিমধ্যেই দানা বেঁধেছে। বিরোধী জোট যে নিছক একটি বালির প্রাসাদ, তা বোঝা যাচ্ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় থেকেই। তদুপরি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ক্রস ভোটিং এটাও প্রমাণ করেছে, বিরোধী দলগুলির ঘরের ভিতরটিও ফোঁপড়া হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্ব মেটার সঙ্গে সঙ্গেই নীতীশকুমারের লালুর সঙ্গ ত্যাগ করে বিজেপির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করা যে বিরোধী জোটের পক্ষে একটি বড় আঘাত— সে না বলে দিলেও চলবে। এই বিরোধী জোটের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার— তা নীতীশের মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা বুঝতে পারছেন। তারা বুঝতে পারছেন— বিরোধী জোটের নেতানেত্রীরা যতই হল্লাবোল করুন না কেন, এদের রাজনৈতিক সততা নিয়ে দেশের মানুষই আজ সন্দিহান। দেশের মানুষ বিরোধী জোটের নেতা-নেত্রীদের ওপর অন্তত এখন আর ভরসা রাখেন না। কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠিত কয়েকটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

বিরোধী জোটের নেতা-নেত্রীরা যতই 'মোদী হঠাও মোদী হঠাও' করছেন, ততই তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়ে যে মোদীর পায়ের তলার মাটি শক্ত হচ্ছে— তাও ওই নির্বাচনগুলির ফলাফল থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। জনসমর্থন হারিয়ে যাওয়ার এই হতাশা থেকেই মায়াবতীর মতো নেত্রী সংসদে পদত্যাগের মতো নাটকও করছেন।

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে 'ভারত ছাড়া' করার ডাক দিয়েছেন। অবশ্য এই ডাক দেওয়ার দিন দুয়েক পরেই দিল্লি গিয়ে তিনি নরেন্দ্র মোদী এবং রাজনাথ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন। এর আগে, ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের সময় এই দিদির ভাইয়েরাই আওয়াজ তুলেছিল— এবার প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তার চাবিকাঠি নাকি দিদির হাতে। স্বয়ং দিদি বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদীকে কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরাবেন। অবশ্য, ২০১৪-র নির্বাচনের পর দিদি এবং তাঁর ভাইদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এটা প্রমাণিত যে, দিদি যা বলেন, বাস্তবে তার বিপরীতই ঘটে। এবার উনি বিজেপিকে ভারত ছাড়া করার ডাক দিয়েছেন। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কাকে বাংলা ছাড়া হতে হয়। ■

অসমে ডিটেনশন ক্যাম্পের নাম করে জেলে বন্দি করে রাখা হচ্ছে

ধর্মানন্দ দেব

শিলচর কেন্দ্রীয় কারাগারকে আদালত, ট্রাইব্যুনাল এবং সরকার যতই 'ডিটেনশন ক্যাম্প' বলে আখ্যা দিক না কেন, পাঁচিলের বাহিরে থাকা আমাদের সবার কাছে সেটা জেল। গারদের ভিতরে যারাই আছে তারা অপরাধী বা বিচারাধীন বন্দি। ২০১০ সালের ৫ এপ্রিল তারিখে তৎকালীন অসমের কংগ্রেস সরকার এক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে (পিএলবি. ১৪৯/২০০৮/৫৪) নির্দেশ প্রদান করে সম্পূর্ণ অস্থায়ীরূপে শিলচরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারকেই 'ডিটেনশন ক্যাম্প হিসেবে ঘোষণা করে। তবে আজ এই নোটিফিকেশনের প্রায় সাত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্প বলে আজ অবধি কোনো সাইনবোর্ড নেই। ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য আলাদা কোনো কর্মীও নেই, জেলের পুলিশরাই ডিটেনশন ক্যাম্পের কর্মী। কারাগারের প্রথম ও প্রধান লোহার প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ডান পাশে একটি বোর্ড সাঁটা রয়েছে আর ওই বোর্ডেই চক দিয়ে লেখা রয়েছে ভিতরের হিসেব নিকেশ। অর্থাৎ হিসেব-নিকেশ রয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্পের অর্থাৎ ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের। হয়তো সব মিলিয়ে মোট ৪৭৯। কিন্তু বিদেশি ট্রাইব্যুনালের রায়ে, সরকারি নথিতে বা জেলের খাতায়-কলমে যতই বিভাজন করে লেখা থাক না কেন, যেমন পাঁচিলের বাহিরে থাকা আমাদের কাছে এটা জেল, তেমনি তথাকথিত ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি মহিলাদের কাছেও সেটা জেল। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় ডিটেনশন ক্যাম্পের নাম করেই বিদেশি ট্রাইব্যুনাল বা পুলিশ মানুষকে প্রেরণ করছে কারাগারে বা সংশোধনাগারে বা জেলে। কেননা ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দি মহিলাদের কারাগারের ভিতরে চলাফেরা এবং ঘুমাতে হয় খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি-সহ নানা অপরাধের মামলায় জড়িত এবং সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের সঙ্গে। এ ধরনের বিরল ঘটনা অসম রাজ্য ছাড়া স্বাধীন ভারতের অন্য কোনো রাজ্যেও নেই, এমনকী বিশ্বের অন্য কোনো রাষ্ট্রেও আছে বলে জানা নেই। তাই এটা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচাইতে লজ্জাজনক ঘটনা। আরো অবাক করার মতো ঘটনা হচ্ছে, কারাগারের নিয়মেই রয়েছে জেল-ম্যানিউয়্যাল মতে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি দেওয়া, আর ঠিক সেই একই ভাবেই ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদেরও খাওয়া-দাওয়া দেওয়া হয়। সকলের জানা, কারাগারে বন্দিদের ১৪ দিন পর পর গাড়ি দিয়ে আদালতে আনা হয়, প্রতি মাসেই স্থানীয় বিচারপতিরা কারাগার পরিদর্শনে যান। কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদের কপালে এটুকুও জোটে না। ওরা কেমন আছে খবরটুকু নেওয়ার কেউ নেই। যেন ওরা 'মানুষ' নয়। তাদের ক্যাম্পে থেকে দুর্দশা ও অব্যবস্থার কথাটুকু জানানোর কি কোনো স্থান নেই ভারতের আইনে বা সংবিধানে? কারাগারের কয়েদিরা যেভাবে দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখার জন্য জানালায় হাজির হন ঠিক সেই একইভাবেই ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দিরা দর্শনার্থীদের নাগাল পেতে হয়। একদিকে চলছে এইসব চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো জঘন্য কাজ আর অন্যদিকে, ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জারি হওয়া পাসপোর্ট ও বিদেশি আইনের উপর দুটি গ্যাজেট নোটিফিকেশন থাকা স্বত্ত্বেও সমগ্র অসম রাজ্য কারাগারের অধীনে থাকা ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্প যথাক্রমে গোয়ালপাড়া, কোকরাঝাড়, শিলচর, ডিব্রুগড়, যোরহাট এবং তেজপুরে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষদের বন্দি করে দেশের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। আমরা যদি শুধুমাত্র শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পের দিকে তাকাই, তখন আমাদের সামনে ফুটে উঠবে এক মর্মান্তিক চিত্র। আমরা নিজের মনকে যদি প্রশ্ন করি কতদিন ডিটেনশন ক্যাম্পে যারা বন্দি রয়েছেন তারা বন্দি থাকবেন? সহজ ভাষায় উত্তর হচ্ছে বন্দিকে বাংলাদেশ সরকার যতদিন গ্রহণ করবে না ওদের নাগরিক হিসাবে ততদিন ওই ডিটেনশন ক্যাম্পেই থাকতে হবে। আর বাংলাদেশ সরকার ওইসব নাগরিককে তাদের নাগরিক হিসাবে স্বীকার করবে না যতদিন পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে কোনো চুক্তি হচ্ছে। তাই তাদের ভাগ্যলিপি কী তা ভাবলেই গা শিউরে উঠে।

আর এই ভাগ্যলিপির মধ্যেই শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং ডিমা-হাসাও জেলার মোট ২৭ জন বন্দির মধ্যে ৪ জন রয়েছেন ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন বা আদেশক্রমে মহিলা বন্দি। এছাড়াও রয়েছেন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মায়ানমার প্রভৃতি বিদেশি রাষ্ট্রের ৩২ জন নাগরিক এবং এদের মধ্যে রয়েছেন ৩ জন মহিলা। শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা ৭ জন মহিলা বন্দির মধ্যে হিন্দু বন্দির সংখ্যা ৪ জন এবং ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন বা আদেশক্রমে ৪ জন মহিলা বন্দিই হিন্দু সমাজের। ওরা হচ্ছে— (১) ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে পিতৃহীন ও স্বামীহারা গীতা নমঃশূদ্র নামের প্রায় ৬০ বছর বয়সের মহিলা। যার বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার পাথার কান্দি থানার মধুরবন্দ গ্রামে। স্বামী মৃত প্রমোদ নমঃশূদ্র

এবং পিতা মৃত সুরেন্দ্র নমঃশূদ্র। এফ.টি কেস নম্বর ১৬/২০০৮।

(২) ২০১৭ সালের ২৯ মার্চ তারিখে পিতৃহীন ও স্বামীহারা সুমিত্রা বাউরি, বয়স অনুমানিক ৪৫ বছর। বাড়ি কাছাড় জেলার সোনাই থানার অন্তর্গত দিদারখুশ ১ম খণ্ড গ্রামে। স্বামী মৃত কুণ্ড বাউরী এবং পিতা মৃত মদন বাউরী। স্বামী মারা যাওয়ার পর সুমিত্রা বাউরী বাসা কাজ করে নিজের জীবন অতিবাহিত করতেন। সুমিত্রার রয়েছে একমাত্র মেয়ে নিকিতা বাউরী। নিকিতার বয়স মাত্র ৫ বছর। সুমিত্রা ডিটেনশন ক্যাম্পে আসার পর নিকিতাকে দেখভাল করছেন সুমিত্রার মামা রঞ্জিত সাহু। এফ.টি কেস নম্বর ১২৫৭/২০১১।

(৩) ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল পিতৃহীন ও স্বামীহারা সীমা বর্ধন, বয়স আনুমানিক ৩৯ বছর। আজ থেকে ৪ বছর আগে সীমার স্বামী মারা যান। রয়েছে ২ ছেলে এবং ১ মেয়ে। কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর থানার জিরিঘাট কলোনির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। রয়েছে একমাত্র ছেলে বাপ্পন দেব। এফ.টি কেস নম্বর ২১১/২০১২।

আর এই ৪ জন বন্দির উপর সরকার নামের যে প্রশাসন 'যন্ত্র' রয়েছে রাজ্যে এবং দেশে সেই 'যন্ত্র' ইচ্ছে করলে ওদের ওপর বহুচর্চিত নোটিফিকেশন দু'টি কার্যকরী করে ওদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু বড় দুঃখ হয় যখন রাজ্যের বিদেশি ট্রাইব্যুনালগুলিও ভুলে যায় যে শিলচর সহ সমগ্র অসম রাজ্যে বিদেশি ট্রাইব্যুনালগুলি স্থাপন হয়েছে এরকমই এক নোটিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে। নোটিফিকেশনটি জারি হয়েছিল ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালে অর্থাৎ Foreigners (Tribunal) Order 1964 আর সেই একই ভাবে বিদেশি আইন, ১৯৪৬ সালের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে ক্ষমতা লাভ করে কেন্দ্র সরকার ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে দুটি নোটিফিকেশন জারি করে তার মধ্যে একটি নোটিফিকেশনে রয়েছে— Foreigners (Amendment) Order, 2015। আর এই নোটিফিকেশনটি রাজ্যে মান্যতা পেয়ে গেলে ডিটেনশন ক্যাম্পের নাম করে জেলে থাকা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু বন্দিরা মুক্তি পেয়ে খোলা আকাশের বাতাস নিতে পারতেন। বরং ঘটনাচক্রে উল্টোটাই ঘটছে। চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের শাসন ভুলণ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যে। বিদেশি ট্রাইব্যুনালে বিচারের নামে চলছে প্রহসন। অসম রাজ্যের জেল/কারাগারের অবস্থা এমনিতেই ভালো নয়, তার উপর রয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্পের নামে অতিরিক্ত বোঝা। তার ফলে ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে বন্দিদের মৌলিক মানবাধিকার কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে সে প্রশ্ন সবার মনে। সত্যি ডিটেনশন ক্যাম্পের চিত্র গভীর উদ্বেগজনক। এমনিতে জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু ২০১৫ সালেই সমগ্র দেশে ১৫৮৪ জন কারাবন্দি মারা যান। এই পরিস্থিতিতেই অসমের ৬টি কারাগারে অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দিদের রাখা হচ্ছে। শিলচর-সহ অসমের প্রতিটি কারাগারে মোট অনুমোদিত বন্দি সংখ্যা থেকে কারাবন্দির সংখ্যা অনেক বেশি, এছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দিদের রাখা হচ্ছে। শুধু তা নয়, এমনিতেই অসমের কারাগারগুলিতে মোট অনুমোদিত পদের প্রায় ৪০ শতাংশ পদ খালি। ওই মোট অনুমোদিত পদ থেকে কম কর্মী সংখ্যা নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ শিলচর-সহ অসমে ডিটেনশন ক্যাম্পের বোঝা সামলাতে হচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়া অর্থাৎ (১) ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর দু'টি নোটিফিকেশন অনুযায়ী বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু বন্দিদের রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করা, (২) জেল থেকে ডিটেনশন ক্যাম্প সরিয়ে শহরের পাশে অন্যত্র আলাদাভাবে তৈরি করা। হ্যাঁ তবে জেলার বাইরে অন্যত্র কোথাও নেওয়া চলবে না। কেননা তখন দুর্ভোগ আরো বাড়বে। (৩) ওই নতুন তৈরি ডিটেশন ক্যাম্পে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা। (৪) ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য আলাদা সুরক্ষা কর্মী নার্স এবং ডাক্তার নিয়োগ এবং (৫) ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য জেলাউপায়ুক্তকে প্রতি ১৪ দিন অন্তর পরিদর্শনের নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, নাগরিকত্ব বিলের ভবিষ্যৎ এখন বিশবাঁও জলে। বিলটি রয়েছে বর্তমানে সিলেক্ট কমিটির কাছে। বিলটির মধ্যে রয়েছে অনেক খামতি বা ফাঁক। মনে প্রশ্ন যে সিলেক্ট কমিটি আদৌ তাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিল করবে কি আর যদি বা করে তবে কবে করবে? দীর্ঘদিন থেকে চোখে পড়ছে না কোনো প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ। শিলচরের সাংসদ তথা সিলেক্ট কমিটির সদস্যাও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। সবকিছুর পর কংগ্রেসকেই দোষারোপ করতে হয়। কেননা ডি-ভোটার তকমা লাগানো হয় কংগ্রেস শাসনকালে, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন প্রথম সংশোধন করে ৬ (ক) ধারা সন্নিবেষ্টিত করা কংগ্রেস শাসনকালে, ডিটেনশন ক্যাম্প কারাগারে তৈরি করা হয় কংগ্রেস জমানায়। অসম চুক্তি করা হয় কংগ্রেসের আমলেই। এখন সমালোচনার বা দোষারোপ করে লাভ নেই কারণ গোটা দেশে কংগ্রেস এখন এক ডুবন্ত টাইটানিক।

এখন প্রয়োজন কেন্দ্রের দেওয়া দু'টি গ্যাজেট নোটিফিকেশন রাজ্যে কার্যকরী করা। রাজ্য সরকারের এখুনি উচিত কেন্দ্রের দুটি নির্দেশ (গ্যাজেট নোটিফিকেশন) মেনে পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনকে এই ব্যাপারে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা। গ্যাজেট নোটিফিকেশনে নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান হবে না, তবে 'ডি' ভোটারের তকমা লাগিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়ে হিন্দুদের দিন কাটাতে হবে না বা পুশব্যাক আটকানো যাবে। ডিটেন ক্যাম্পে থাকা হিন্দুরা ছাড় পাবেন। এই লড়াইয়ে অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে বাঙালি হিন্দুদের একক শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ ও আত্মবলীয়ান হয়ে চাপ সৃষ্টির লড়াইয়ে নামতে হবে। এখুনি উপযুক্ত সময়। নতুবা অসম রাজ্যের বাঙালি হিন্দুর ভাগ্যলিপির কোনো পরিবর্তন হবে না।

(নিবন্ধকার পেশায় আইনজীবী)

যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এখন আওয়ামি লিগের হাত ধরেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে জামায়াতে ইসলামি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহায়তা করেছে, বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী (রাজাকার, আল শামস, আল বদর) তৈরি করে বর্বর গণহত্যা চালিয়েছে, হিন্দু নিধন ও বিতাড়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এবং স্বাধীনতার দীর্ঘ চার দশক পর যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে শীর্ষ নেতাদের বিচার ও ফাঁসি কার্যকর হয়েছে— সেই জামায়াত এখন রাজনীতিতে খোদ আওয়ামি লিগের হাত ধরেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জামায়াতকে জোট ছাড়া করতে বিএনপি'র ওপর চাপ দিয়ে আসছেন নানাভাবে। আওয়ামি লিগের সর্বস্তরের নেতারা জামায়াতকে নির্মূল করতে দিনরাত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সেই জামায়াতের সঙ্গে গাঁটছড়া? অবিশ্বাস্য ব্যাপার, হতেই পারে না— এ বিশ্বাস সাধারণ মানুষের। কিন্তু দিন পাল্টাচ্ছে। অভিযোগ উঠছে, একপাশে হেফাজতে ইসলাম, অন্যপাশে জামায়াতে ইসলামকে নিয়ে ভোটের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হতে চাইছেন শেখ হাসিনা।

গত বছর উত্তরাঞ্চলে আওয়ামি লিগের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের শাখা সংগঠনের নেতারা যখন জামায়াত নেতাদের ফুল দিয়ে আওয়ামি লিগে বরণ করে নিচ্ছিলেন, তখন গোটা দেশের মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলের নেতাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। সাংবাদিকদের বলেছিলেন, জামায়াত নেতাদের দলে নেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে যারা মানুষ হত্যা করেছে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে পরিকল্পিতভাবে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছে তাদের দলের নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে মানুষ লক্ষ্য করে, সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের পরও বিভিন্ন স্তরের জামায়াত নেতাদের আওয়ামি লিগে নেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপক দাবি সত্ত্বেও শেখ হাসিনা এই যুদ্ধাপরাধীদের দলকে নিষিদ্ধ করতে সায় দেননি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, কেন সায় দেননি তা ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ঘটনা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিগত ঈদুল ফিতরের আগে জামায়াতে ইসলামির দুর্ধর্ষ ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরের দুই শীর্ষ নেতাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসের অভিযোগ ছিল। জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে আমির ও মহাসচিব, যুগ্ম মহাসচিবদের সবারই যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ফাঁসি হয়েছে। অন্যতম শক্তিধর শীর্ষনেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদির বিরুদ্ধে হত্যা ও ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও তার ফাঁসি হয়নি, আজীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আপিলেও সেই দণ্ড বহাল রয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র জানাচ্ছে, কারাগারে বহাল তবিয়তে থাকা এই জামায়াত নেতার সঙ্গে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের আলোচনা হচ্ছে সমঝোতা নিয়ে। আর এ ব্যাপারে জামায়াতের আরেক শীর্ষনেতা ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, যিনি এখন লন্ডনে থাকেন, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কয়েকজন রাজনীতিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করেন, আওয়ামি লিগ জামায়াতকে ত্যাগ করার জন্যে বিএনপির ওপর চাপ দিচ্ছে মূলত দুটি লক্ষ্য নিয়ে। এক, বিএনপিকে দুর্বল করে ভোট কমানো। দুই, জামায়াতকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট থেকে বের করে এনে একটা

নির্বাচনী সমঝোতা তৈরি করা। এভাবে আওয়ামি লিগ দুই কট্টর ইসলামি দল হেফাজতে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামকে পাশে নিয়ে ইসলামপন্থীদের ভোট নিশ্চিত করতে চায়। হেফাজতে ইসলামকে ইতোমধ্যে কব্জায় নিয়েছে আওয়ামি লিগ, এখন লক্ষ্য জামায়াতের দিকে। কয়েক বছর আগে আরেক কট্টর ইসলামি দল খেলাফতে মজলিশের সঙ্গে

সাত দফা চুক্তি করেছিল আওয়ামি লিগ। কিন্তু তীব্র প্রতিবাদের মুখে সে চুক্তি বাতিল করতে হয়েছিল। গত আট বছরের শাসনামলে ব্যাপক দুর্নীতি ও অপশাসনে আওয়ামি লিগের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ায় এখন ইসলামি দলগুলোর সঙ্গে সখ্যতার ওপর জোর দিতে হচ্ছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুরা বরাবরই আওয়ামি লিগকে ভোট দেয়। এসব সিদ্ধান্ত তাদের আহত করলেও শেখ হাসিনা এ নিয়ে ভাবতে রাজি নন।

ভাস্কর্য অপসারণে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ।

সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামি লিগের দুটি সিদ্ধান্ত ছিল অবাক করার মতো। এক, সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে গ্রিক দেবীর ভাস্কর্য অপসারণে হেফাজতে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামিসহ মৌলবাদী দলগুলোর যুদ্ধং দেহি মনোভাবের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা। এই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিলেন হিন্দু প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। দুই, সৌদি সামরিক জোটে বাংলাদেশের শামিল হওয়া। সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্য মৌলবাদীদের মতে মূর্তি অপসারণে শেখ হাসিনা যেভাবে খোলামেলা ইসলামি ভূমিকা নিয়েছেন, তা শুধু হিন্দুদের নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজনকেও প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করে। মন্ত্রীসভার তিন সদস্য সরকারের এই ভূমিকার সমালোচনা করায় হাসিনা জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের এক অনুষ্ঠানে সবার সামনে তাদের মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। এই তিন মন্ত্রী হলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। নীরবে এই ধমক হজম করতে হয় তিন মন্ত্রীকে। মৌলবাদীদের প্রতি এই ধরনের কুৎসিত সমর্থন সবাইকে বিস্মিত করেছে। গোটা বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটে যাওয়ার পর এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, বাংলাদেশ থেকে সেনা পাঠানো হলে তাদের পাকিস্তানি জেনারেলের অধীনে কাজ করতে হবে।

এই পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। সৌদি জোটে যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্যে অবমাননাকর হলেও মুসলমান ভোট নিশ্চিত করতেই হাসিনা জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ বাংলাদেশের মুসলমানদের বড় অংশের ওপর সৌদি প্রভাব রয়েছে। সৌদি আরবে কাজ করেন বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি।

বাংলাদেশ এখন কোন পথে? একাত্তরে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের চেতনাকে সামনে রেখে। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে এই চেতনা চার মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল— গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতার মূল ভিত্তিই ছিল এই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান একথা বহুবার উল্লেখ করছেন। জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাতিল করেন। জেনারেল এরশাদ যুক্ত করেন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রক্ষা করেন, তবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন। এখন এভাবেই বলতে হয়, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এখন এভাবেই দেখতে চান। একারণেই মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এখন এক হাতে জঙ্গিবিরোধী অভিযান চালিয়ে বিশ্বে প্রশংসা কুড়োচ্ছে, অন্য হাতে জঙ্গি তৈরির কারখানা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের আগামী দিনের পথরেখা কি এভাবেই নির্ধারিত হবে? ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

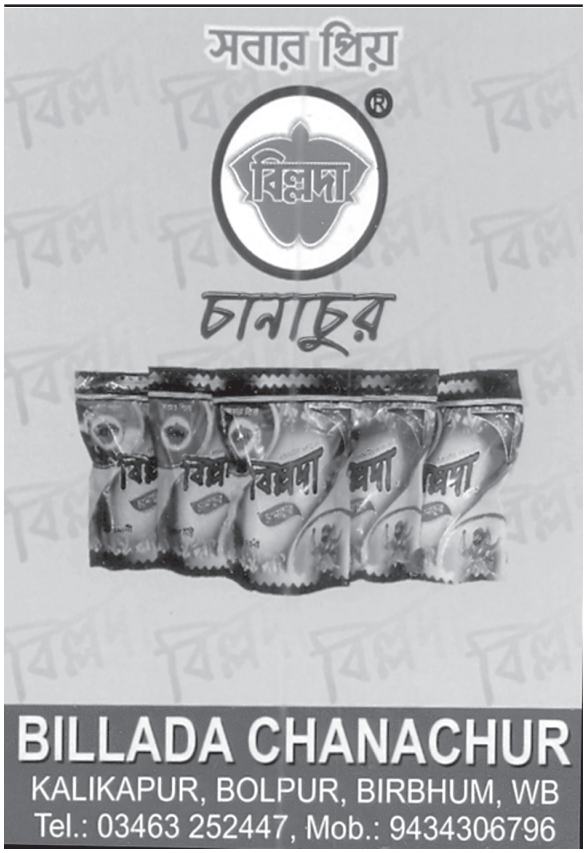

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

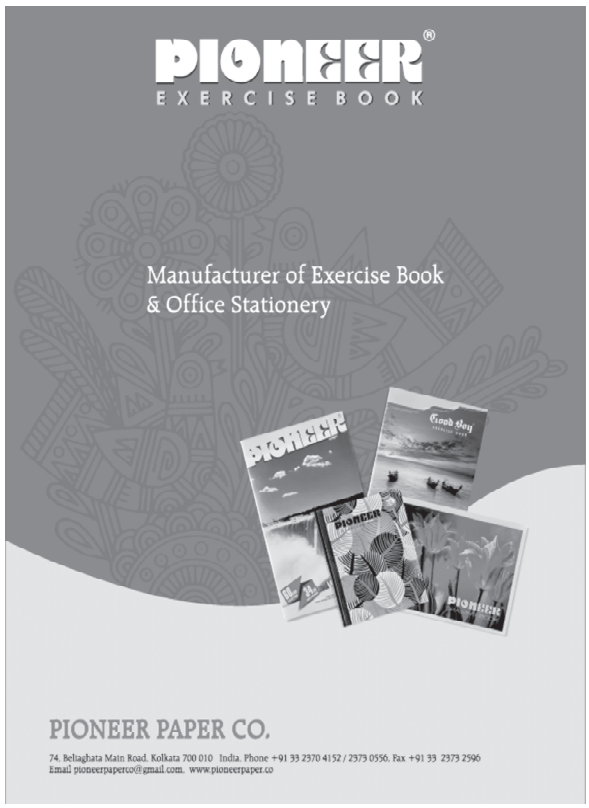

২৪ নভেম্বর, ১৯২৬
শ্রীকৃষ্ণ এলেন পণ্ডিচেরী আশ্রমে

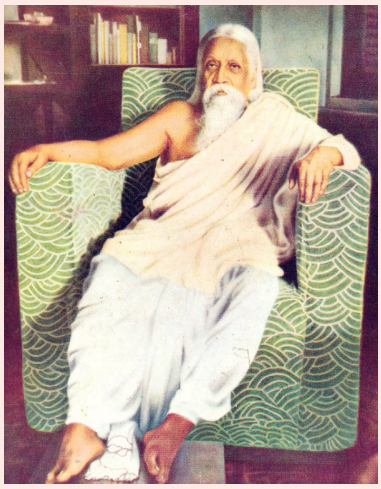

শেখর সেনগুপ্ত

যতবার ভারতের দক্ষিণ দিকে উড়ান দিয়েছি, পণ্ডিচেরী আমাকে টেনে নিয়েছে। চার দশক আগে টানা কুড়ি দিন অবস্থান করেছি পার্ক গেস্ট হাউসে। আশ্রম থেকে অনেকটা দূরত্বে ছিল একটি মহুয়া গাছ, যার তলায় বসে অরবিন্দ চর্চায় আমার হাতেখড়ি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাজকুমার তলোয়ারের কাছে— যিনি সঞ্জয় গান্ধীকে তথাকথিত মারুতি নির্মাণে দানখয়রাতি করতে সম্মত না হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং সব ছেড়েছুড়ে আশ্রয় নেন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অলিন্দে। তলোয়ার সাহেবই আমাকে প্রথম বলেন, 'শ্রীঅরবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে এনেছিলেন এই আশ্রমে। ২৪ নভেম্বর, ১৯২৬-এ। কথাটা স্পষ্টত হেঁয়ালি মনে হয়েছিল আমার। কিছুক্ষণ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিকে নিয়ে গেলাম অনেকটা দূরে। জনৈকা পাতাকুড়ানি ঝোলা নিয়ে ঘুরঘুর করছেন। সমুদ্রের আছাড়ি-পিছাড়ি ও গর্জন ছাড়া আর কোনো কলরব না থাকলেও মাতাল হওয়ার দাপট ছিল ষোলআনা। রহস্যপ্রিয় আর এ তলোয়ার তখন বললেন, 'আমি কেন এ তথ্য দিলাম, তার উৎস খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে, সেনগুপ্ত।'

আমি সন্ধানী হয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে অরবিন্দ তাঁর যে উপলব্ধির কথা একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন, আমি তাঁর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনন্য ঋষি লেখক। তিনি তাঁর রচনায় জাতিকে আড়ামোড়া ভেঙে জেগে ওঠার মন্ত্র দেন। তিনিই যথার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব ও মহিমাকে প্রথম অনুধাবন করেন।'

লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন, 'আমি শ্রীকৃষ্ণকে এক ঐতিহাসিক পুরুষ বলেই বিশ্বাস করি। তাঁর মধ্যে ছিল এবং এখনও আছে ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের স্থিতি।'

শ্রীঅরবিন্দের ওই উপলব্ধি যে কতটা সত্য, তার প্রমাণ মেলে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতায়— যেখানে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে উপস্থিত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

'এষা ব্রাহ্মী স্থিতি ঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।।'

শ্রীঅরবিন্দ যখন ক্রমে ঋষি অরবিন্দে রূপান্তরিত হচ্ছেন, তখন তিনি মুখ্যত শ্রীকৃষ্ণকেই অবলম্বন করেছেন। অধিকাংশ সময় একাকি থাকতেন বদ্ধ ঘরে। কদাচিৎ বেরিয়ে আসতেন আশ্রমের বাইরে। খানিক বিচরণ করেছেন প্রাকৃতিক অলিন্দে। একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে ইতস্তত দেবদারু, শিরিষ, খেজুর, মহুয়া, পলাশ। সামুদ্রিক পপসঙ্গীত তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না, বৃক্ষাদির ছায়ানৃত্যও তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর আনে না। ভাষাহীন প্রত্যয়ে তিনি যেন উচ্চারণ করতেন, 'তিনি আসবেন'।

ঋষি অরবিন্দের সকাতর আহ্বান বৃথা যায়নি। সত্যি সত্যিই শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন পণ্ডিচেরী আশ্রমে। ভক্তের ডাকে ভগবান যে সশরীরে এসে উপস্থিত হন— এইটি কোনো ফেলনা আপ্তবাক্য নয়। হিন্দুধর্মের একাধিক বিখ্যাত সাধক তার প্রমাণ দিয়েছেন। আজও এমন অনেক হিন্দু সাধক আছেন, যাঁরা আপন পরিচিতি ও গ্লামারের লেনদেনে বিশ্বাসী নন, কিন্তু তন্নিষ্ঠ সাধনায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। আমি যখন দক্ষিণ কলকাতার লেক কালীবাড়ির বর্তমান কর্ণধার শ্রীনিতাইচন্দ্র বসুর সঙ্গে যুগ্মভাবে ওই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তন্ত্রাচার্য শ্রীশ্রীহরিপদ চক্রবর্তীর জীবনালেখ্য রচনায় নিবিষ্টচিত্ত, তখন আদরে অনাদরে লুক্কায়িত বহু তথ্য ও ঘটনার সন্ধানে গিয়ে জানতে পারি, এই মহান সাধক বেশ কয়েকবার করুণাময়ী মা কালীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, দু-জনের মধ্যে কথাও হয়েছেও যার প্রভাবে ম্রিয়মাণ সাধক টগবগিয়ে উঠেছেন ঐশী শক্তির দ্বারা অগুনিত মানুষের বিপদ ও ক্লেশ মোচনে। সুতরাং ঋষি অরবিন্দের ডাকে সাড়া দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে পণ্ডিচেরী আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় আমি কোনো অবিশ্বাসের লেশমাত্র খুঁজে পাই না।

সেই বিশেষ দিনটি হল ২৪ নভেম্বর, ১৯২৬।

বেশ কিছুদিন ধরে প্রত্যেকেই লক্ষ্য করছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ যেন গভীর সাধনার প্রভাবে আশ্চর্য অন্তর্মুখীন গভীরতায় নিমজ্জিত। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে নিরাশ হন। অরবিন্দ কথা বলবার মতো অবস্থায় নেই। ১৯২৫ সালের ১৫ আগষ্ট নিজের জন্মদিনে ঋষি অরবিন্দ তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন, 'ভৌতিক জগৎ (Physical world) জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে পূর্ণতার এমন স্তরে পৌঁছেছে যে তার গণ্ডী ভাঙবে। বিশ্বের পরিমণ্ডলে এবার সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে জ্যোতি ও শক্তির সেই ধারক (শ্রীকৃষ্ণ) নেমে আসবেন।'

মোট ২৪ জন শিষ্য-শিষ্যার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯২৬ সালের ২৪ নভেম্বর সেই যুগান্তকারী মুহূর্তটির সাক্ষী থাকার। ওই ২৪ জন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লেখক পুরাণীও। তিনি তাঁর সুখ্যাত 'Life of Aurobindo' গ্রন্থে ঘটনার সেই বিবরণ তুলে ধরেছেন। ■

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি না কল্পিত নায়ক ?

প্রীতীশ তালুকদার

হে ভক্তগণ! আমি তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ বলছি। আমি কোনো বাস্তব ঐতিহাসিক ব্যক্তি না কবির কল্পনারাজ্যের মানস সৃষ্টি তা নিয়ে এখনও তোমাদের মনে ও সমাজে যথেষ্ট দোলাচল আছে তাই আমার এই মুখরতা। তোমাদের কারও মতে কৃষ্ণ বিষয়ে যা কিছু পুরাণাদি গ্রন্থগুলিতে আছে তার সবটাই প্রশ্নাতীত সত্য; আবার কারও মতে কৃষ্ণ ও কাব্য-পুরাণাদি গ্রন্থগুলি ঐতিহাসিক বাস্তবতাহীন কল্পনা মাত্র। অবিশ্বাসী, বিশ্বাসী, ভক্ত, যুক্তিবাদী প্রভৃতি যে যাই হোক যে হেতু আমি সনাতন হিন্দু জাতির মন ও মানসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট সে হেতু যে যে ভাবেই দেখুক না কেন কেউই আমার প্রাধান্য ও আমাকে নিয়ে আলোচনা উপেক্ষা করতে পারে না। আমাকে নিয়ে যাঁরা চিন্তা ও আলোচনা করে তাঁদের যদি দুটো ভাগে ভাগ করি তবে একভাগে আছে তাঁরা যাঁরা মনে করে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে মানব দেহে এই মর্তভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সে বিষয়ে সন্দহের কোনো অবকাশই নাই। তবে এই বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ধরণ ও কারণ তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তাঁরা মনে করে— (ক) ধর্মশাস্ত্র ও ভগবান বলে কথা! ধর্মগ্রন্থরূপে যা কিছু আছে এবং তাতে যা কিছুই আছে তা প্রশ্নাতীত ভাবে অভ্রান্ত সত্য; অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসতে পারে না। (খ) পরম্পরাগত প্রচলিত জড়তা ও সংস্কারবশত অন্ধবিশ্বাসের কারণে উদ্ভূত মানসিক দুর্বলতায় অবিশ্বাসের সাহস নাই। (গ) নিত্যকৃত পাপ মোচন ও স্বর্গলাভের পথ বলে মনে করে। (ঘ) কৃষ্ণকে নিয়ে ধর্মব্যবসা বেশ ভালো চলে।

অপর দিকে যাঁরা আমাকে ঐতিহাসিক নয়, কাল্পনিক কাব্যচরিত্র বলে মনে করে সেই অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের কারণগুলো এরকম— (ক) নিজেকে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল রূপে উপস্থাপিত করাটা একটা শৈলী হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা প্রমাণের জন্য ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচারণকেই উপায় রূপে ভাবা। (খ) রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থ ও তার চরিত্রগুলির অযৌক্তিকতার কারণে বাস্তব ইতিহাস বলে গ্রহণ করা যায় না। (গ) এই গ্রন্থগুলোতে সময়কালের কোনো নির্ভরযোগ্য উল্লেখ নাই। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও পাওয়া যায় না। (ঘ) এই সকল ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর গঠন ও বর্ণনা কাব্যিক ও নীতিগত, ঐতিহাসিক বর্ণনা মনে হয় না।

এখন প্রশ্ন যে, এই গ্রন্থগুলিই যদি কাল্পনিক হয় তবে ওই গ্রন্থগুলিতে

বর্ণিত আমিও (কৃষ্ণ) কাল্পনিক, এটাই স্বাভাবিক। প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসীদের জড়তা ও অন্ধবিশ্বাসের চাইতে দ্বিতীয়শ্রেণীর ব্যক্তিরা বরং শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁদের বক্তব্যে যুক্তি, চিন্তা ও বিচারবোধের ছাপ অন্তত আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, তাঁদের এই যুক্তি উপস্থাপনার পিছনে আছে এক পূর্বগৃহীত বিরুদ্ধ বিশ্বাস ও বিশেষ মনগত অবস্থা এবং অবশ্যই অনুসন্ধানের অভাব। তাই তাঁদের বক্তব্যে যুক্তি থাকলেও সে যুক্তিও এক প্রকার অন্ধবিশ্বাস প্রসূত তা বলা যায়। এঁরাও এই গ্রন্থগুলো যথাযথ পাঠ ও তাতে সত্য অনুসন্ধান করে না। অপর দিকে উপলব্ধিহীন, যথাযথ অনুসন্ধানহীন, আংশিক, যুক্তিহীন, বিকৃতার্থে যে বিশ্বাস তা ধর্ম, ভক্তি বা বিশ্বাস নয়, তা অধর্ম, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার। তাই এটা বলা যায় যে, উভয় প্রকারের চিন্তা, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত বাহ্য মতামত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সনাতন হিন্দু সন্তানগণ নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের যথাযথ অনুসন্ধান এখনও করেইনি। এ সবের মধ্যেও কিছু স্বাভিমানি হিন্দুসন্তান এবং দেশি-বিদেশি ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা যেটুকু খুঁজে পেয়েছে সেই আলোকেই আমার ঐতিহাসিকতা বা অলৌকিকতা বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যেতে পারে। এসো এবার সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তোমরা নিশ্চয়ই বোঝ যে সত্যে পৌঁছতে যুক্তি, তথ্যাদির প্রমাণ এবং অবশ্যই বদ্ধ ধারণা হতে মুক্ত মন ও চিন্তা আবশ্যক। এসো সেই পথে অগ্রসর হয়ে দেখি।

আমার নাম, পরিচয়, কর্ম তোমরা জেনেছ মহাভারত ও পুরাণগুলি থেকে। এই গ্রন্থগুলিই আমাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। তাই জানতে এগুলোকে অবলম্বন করতেই হবে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি ইতিহাস নয় কল্পকাব্য এইরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত, তাই এগুলোর কোনো বাস্তবতা আছে কি না সেটাই আগে দেখা যাক।

আমার জীবনের বৃহত্তম অংশ মহাভারতে বিধৃত, তাই মহাভারত দিয়েই শুরু করা যাক। মহাভারতকার ব্যাসদেব গ্রন্থের শুরুতেই তাঁর এই গ্রন্থকে ইতিহাস, পুরাণ ও বেদ-বেদাঙ্গের সার বলেছেন। মহাভারতের ছত্রে ছত্রে বিভিন্ন মুনি-ঋষিরা এই গ্রন্থকে ভারতবংশের ইতিহাস অভিধা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে এই গ্রন্থ ইতিহাস অর্থাৎ ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা, পুরাণ ও বেদ-বেদাঙ্গের দার্শনিক উপদেশের সমন্বয় দ্বারা গ্রন্থিত কাব্য। কিন্তু কেউ কিছু লিখে সেটাকে ইতিহাস বললেই তোমরা সেটাকে নির্দ্বিধায় ইতিহাস বলে মেনে নেবে না, এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গতও। তোমরা ইতিহাস পড়, ইতিহাস জান; এ গ্রন্থ তোমাদের জানা ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তো ভাবতে হবে যে, তোমরা এখন ইতিহাস বলতে যা বোঝো তা বর্তমান সময়ের গঠনতন্ত্রে গঠিত এবং তা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে। স্মিথ সাহেবের দৌলতে এ ইতিহাসের সঙ্গে তোমরা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে পরিচিত। তার আগে দুই সহস্রাব্দ ধরে শিক্ষাদীক্ষার পাঠ তো তোমরা তুলেই দিয়েছিলে, শেষের দিকের ইসলামিক যুগে প্রায় এক সহস্রাব্দ যার সর্বাধিক অবনতি ঘটেছিল। কতিপয় মানুষের মধ্যে যাও অবশিষ্ট ভাবে প্রচলিত ছিল তা স্মৃতি, ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, ছন্দ ও জ্যোতিষ এবং শেষে মঙ্গলকাব্য। তাই যখন ইউরোপীয় আধিপত্যের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্যের জড়বাদি শিক্ষাব্যবস্থায় ধাঁচে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলো এবং তোমরা ফের শিক্ষামুখী হয়ে উঠলে তখন এক ইতিহাসের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হলো। সেই পরিচয়ে ইতিহাস গ্রন্থ ও তার বিষয়ের গঠন এবং প্রকৃতি বিষয়ে যে ধারণা তোমরা পেলে এবং এখনও পেয়ে চলেছ সেটাই তোমাদের মনে ইতিহাসের একমাত্র সংজ্ঞা ও মাপকাঠি হয়ে গেঁথে গেল। কিন্তু এটাও তো ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, তোমরা আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্য রীতিতে ইতিহাস বলতে যা জানলে সেই ইতিহাসের সংজ্ঞা ও গঠন এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সংজ্ঞা ও গঠন এক হবে এমন কোনো কথা নেই। তাই সেই সময়ে 'ইতিহাস' বলতে বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ না কল্পকাব্যকে বোঝানো হোত তা দেখা প্রয়োজন।

''ধর্মার্থকামমোক্ষনাম্ উপদেশসমন্বিতম্ পূর্ববৃত্তং
কথাযুক্তমিতিহাসম্ প্রচক্ষতে।''

অর্থাৎ 'মানুষের প্রাপ্তব্য (যা পেতে চায়) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভে সহায়ক শিক্ষালাভ হয় এমন উপদেশ ও উপকথা ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে যে উপস্থাপনা তাই ইতিহাস।' এখান থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, ঘটে যাওয়া ঘটনার নীরস বর্ণনা বর্তমানের ইতিহাস হলেও তৎকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে মানুষ যাতে সহজ ভাবে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম জীবনের সত্যলক্ষ্য পুরণের জ্ঞান ও শিক্ষা পেতে পারে তার জন্য উপদেশ ও উপকথা যুক্ত হোত ওই ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে। তাকে ইতিহাস বলতেন তাঁরা। মহাভারতে পুরাণও আছে, তাই পুরাণকেও জানা প্রয়োজন। 'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চবংশমন্বন্তরানি চ বংশানুচরিতচেতি পুরাণম্ পঞ্চলক্ষণম্।' অর্থাৎ 'সৃষ্টিপ্রলয়ান্তর নতুন সৃষ্টি, মনুগণের বংশ ও শাসনকাল, রাজ-রাজেন্দ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বংশচরিত বর্ণনা পুরাণের লক্ষণ।' অতএব পুরাণেও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাস আছে। এতদূর পর্যন্ত যা পাওয়া গেল তাতে এটা জানা যাচ্ছে যে, মহাভারতে বেদ-বেদাঙ্গের দার্শনিক জ্ঞান, উপকথা, সৃষ্টি-স্থিতি- প্রলয়াদি তাত্ত্বিক বর্ণনা যেমন আছে তেমনি সেখানে প্রকৃত ঘটে যাওয়া ঘটনার ইতিহাসও আছে। প্রকৃত ঘটে যাওয়া ঘটনা যদি থাকে তবে মহাভারতে ও পুরাণে বর্ণিত ঘটনা সত্যই ঘটেছে; তা ইতিহাস, কল্পনা নয়। আর যদি ঘটনা সত্যি হয় তবে ঘটনা যাঁদের দ্বারা ঘটেছে তাঁরাও বাস্তব চরিত্র, কবি মনের সৃষ্টি নয়। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, ব্যাসদেব, ভীষ্ম বাস্তব চরিত্র হলে আমি অর্থাৎ তোমাদের কৃষ্ণও বাস্তব চরিত্র। ড. আর জি ভাণ্ডারকর বলেছেন— 'শ্রীকৃষ্ণ পার্থিব জীবনে ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্মসংস্থাপন ও প্রকৃত কর্মানুশীলনের ফলে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগে ভারতীয় জনগণ কর্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে থাকে।' (ড. আর. জি. ভাণ্ডারকর তাঁর বৈষ্ণবইজম্ অ্যান্ড শৈবইজম্' গ্রন্থে বলছেন,— ''Bashudeva Krishna had a historic basis and circumstances which led to him being invested with the supreme god head occurred later time.'')

ঐতিহাসিক সুনীল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' গ্রন্থে বলছেন,—''প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চায় রামায়ণ ও মহাভারতের গুরুত্ব উপেক্ষা করা চলে না। এই মহাকাব্য দুটিতে ইতিহাস ও কাব্যের অপূর্ব মিলন ঘটেছে।'' ড. রায়চৌধুরী তাঁর 'আর্লি হিস্ট্রী অফ্ দ্য বৈষ্ণবা সেক্ট' গ্রন্থে বলছেন,— ''The pre-epical Literature of the Hindus know a human Krishna, but is si-

lent about deity Krishna. Buddhist and Jain traditions clearly refar to Vashudeva as a human hero.... Krishna certainly lived befor Buddha, as his mentioned in the 'Chhandyogys Upnisad, which is a pre- Buddhistic work."

এস. এন. মজুমদার তাঁর 'ক্যানিংহামস্ এনসিয়েন্ট জিওগ্রাফি অফ্ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে ঐতিহাসিক জেনারেল ক্যানিংহামের গবেষণা এভাবে তুলে ধরেছেন— "The holy city of Mathura is one of the most ancient place in India. It is famous in the history of Krishna, as the strong hold his enemy Raja Kansa ; and it is notised by Arrian on the authority of Megasthenes, as the capital of Surasenoi. Now Surasena was the grandfather of Krishna and his seconds, who held Mathura after the deth of Krishna, were called Surasenas."

ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'হিন্দুর দেব-দেবীর উদ্ভব ও বিকাশ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বলছেন,— 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীই হোক আর খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দীই হোক, শ্রীকৃষ্ণ যে নরদেহধারী মর্তবাসী ছিলেন, সে বিষয়টি প্রায় সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন।' পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এটা প্রমাণ করে যে মহাভারতে বর্ণিত ঘটনা ও কৃষ্ণ কোনো অলীক কাব্যনায়ক নয়, বরং এই জগতে জন্ম নেওয়া তোমাদের মতোই একজন রক্তমাংসের মানুষ; তবে এর সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, আমার কাহিনী ও ইতিহাসের উপাদান-গ্রন্থে অনৈতিহাসিকতারও যথেষ্ট মিশ্রণ ঘটেছে। এস দেখি মহাভারত ও পুরাণ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ দ্বারা আমার ঐতিহাসিক চরিত্রের পুষ্টি ঘটে কি না।

প্রাচীন গ্রন্থ কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী বলছে কলির ৬৫৩ অব্দে গোনর্দ কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন, গোনর্দ ও যুধিষ্ঠির একই সময়ের দুই রাজা। অতএব যুধিষ্ঠির ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হয়, যুধিষ্ঠির 'ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তথা কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আমি অবশ্যই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাছাড়া যুধিষ্ঠির আমার নিজের পিসিমার ছেলে, আমার পিসিমা ও পিসিমার ছেলে ঐতিহাসিক হলে আমার ঐতিহাসিকতাই তো প্রমাণ করে। পাণিনী খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের মানুষ। তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রাচীনতম সমৃদ্ধ ব্যাকরণ হিসাবেই নয়, তৎকালীন সময়ের ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য মূল্যবান আকরগ্রন্থ রূপেও সমাদৃত। তিনি তাঁর গ্রন্থে জনগোষ্ঠীর উপমাচ্ছলে 'বাসুদেব বর্গ' ও 'অর্জুন বর্গে'র উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপমায় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীরই উল্লেখ হয়ে থাকে সাধারণত। প্রকৃতপক্ষে হস্তিনাপুর ও মথুরায় আমার ও অর্জুনের উত্তরপুরুষরাই রাজত্ব করছিল, আর আমরা যে তৎকালীন ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আমাদের বংশ যে বিশিষ্ট তা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন' দ্বারা আমার ও অর্জুনের গভীর বন্ধুত্বকেও মেনে নেওয়া হয়েছে। উত্তরপুরুষ থাকলে তাঁদের পূর্বপুরুষও থাকবে, তাই আমাকে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পতঞ্জলির (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক, প্রায় আমার সমসাময়িক।) মহাভাষ্যে 'বৃষ্ণিভ্য বাসুদেবা' দ্বারা বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ বাসুদেবের উল্লেখ বৃষ্ণিবংশ ও আমার বাস্তবতার প্রমাণ দেয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে অঙ্গিরস বংশীয় ঘোর ঋষির শিষ্য দেবকী পুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদগুলোর মধ্যে পড়ে। বিভিন্ন মত থাকলেও খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বের অবশ্যই। ঋগ্বেদের কয়েকটি সুক্তের ঋষিও আমি। বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মানুষ; বৌদ্ধদের সুক্তপিটকের দিঘনীকায় কাহায়ন গোত্র ও কাহা ঋষির উল্লেখ আছে। আমিই যে কাহা তা তোমরা জান। বৌদ্ধ ঘটজাতকে উল্লেখ আছে যে, অন্ধকবেহ্নু (বসুদেব, অন্ধক গোষ্ঠির) ও দেবভগ্গার (দেবকী) পুত্র বাসুদেব ও বলদেবকে নন্দগোপার (নন্দের স্ত্রী) কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাসুদেবের স্ত্রী জাম্ববতী, তাও উল্লেখ আছে।

জৈনধর্ম বুদ্ধ পূর্ববর্তী। জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরও বুদ্ধ পূর্ববর্তী, আমার সময়ের আরও কাছের। জৈনধর্মগ্রন্থ অভিধান চিন্তামণির মর্তকাণ্ডে আমি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর রূপে বর্ণিত। এ গ্রন্থ সেই সময়েরই। আমার মা দেবকী ও রোহিণী, দাদা বলদেবেরও উল্লেখ আছে এ গ্রন্থে। ঐতিহাসিক ক্যানিংহাম তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থেনিস ভারতে এসে কৃষ্ণ-ইতিহাসমুখর অতি প্রাচীন নগর মথুরাকে দেখেছিলেন যেটা সুরসেনিয়দের রাজধানী ছিল। এবং এটাও জানতে পেরেছিলেন যে, সুরসেন আমার ও তখনকার সুরসেনীয়দের পূর্বপুরুষ, যে সুরসেনীয়রা কৃষ্ণের পর সেখানে রাজত্ব করছে। মথুরা অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে, যাতে চক্র অঙ্কিত ও 'বৃষ্ণিরাজন্যত্রতারস্য' মুদ্রিত যা বৃষ্ণিবংশের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের প্রমাণ। মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণপ্রয়াণের পর দ্বারকা নগরী সমুদ্র গ্রাস করে বা সমুদ্রে বসে যায়। বর্তমানে গুজরাট উপকুলবর্তী আরবসাগরের অগভীরে অনুসন্ধানে প্রাচীন নগরীর অবশেষের প্রমাণ মিলেছে যা মোটামুটি ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বের বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছে। এটা মহাভারত ও পুরাণের বর্ণনায় ঐতিহাসিকতার প্রমাণ। হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র, আত্রাঞ্জিখেরায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাচীন সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে সভ্যতার বয়স এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বের। তাছাড়া মহাভারতে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থান, সমুদ্র, নদী, পাহাড়, বন, বিভিন্ন রাজবংশ ও ঋষিবংশের বংশতালিকা, তৎকালীন সময়ের রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থা, আইন, জীবনযাত্রা, জীবিকা, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে, যা ঐতিহাসিক দলিলের প্রমাণ দেয়। এখনও আমাদের দেশে বহু নগর ও জনপদের যে নাম প্রচলিত আছে যে নাম অতি প্রাচীন ও মহাভারতে উল্লিখিত। এই সমস্ত দিক নিরপেক্ষ ভাবে পর্যালোচনা করলে তা আমার ঐতিহাসিকতা বিষয়ে তোমাদের সন্দেহের নিরসন ঘটাবে এটা ধরে নেওয়া যায়।

এতক্ষণ তোমরা যা পেলে তা হলো, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে ইতিহাস আছে এবং আমি কবির মনজগতের কাব্যনায়ক নই, আমি এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া তোমাদের মতোই একজন। কিন্তু যে জন্মেছে তাঁর জন্ম ও জীবদ্দশার একটা সময়কাল থাকবে। এবার এসো আমরা

সে বিষয়ে প্রবেশের চেষ্টা করি, কারণ অবিশ্বাসীদের এটা একটা যুক্তি। তাছাড়া জ্ঞাতব্য বিষয় যথাসম্ভব পরিপূর্ণরূপে জানার চেষ্টা করাই উচিত।

মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থগুলিতে সংগঠিত ঘটনার কোনো সাল-তারিখ নেই, তাতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ও আমার জীবৎকালের কোনো সময়কাল বলা নেই, এটাই যুক্তিবাদিদের কাছে আমার ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের অন্যতম যুক্তি। কিন্তু তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি যে, এই যুক্তিতে মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থগুলি এবং এগুলির কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বাস্তব অস্তিত্বও বিপন্ন হয়। বলতে হয় মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থ কেউ কোনোদিন লেখেনি এবং এই গ্রন্থগুলোর বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তোমরা এই গ্রন্থগুলো দেখছ এবং ব্যাসদেব এগুলো রচনা করেছেন তা বলছ। চন্দ্রগুপ্ত, সম্রাট অশোক, তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈন, ভগবান বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি তোমাদের ইতিহাস স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের সময়কালও তৎকালীন কোনো গ্রন্থে সাল-তারিখ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট করা নেই। এঁদের সময়কাল নিয়ে বহু মত আছে, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সূত্র ধরে নিরুপণ করেন মাত্র। তবে এঁদের ঐতিহাসিক পুরুষ রূপে মেনে নিয়েছ কেন? ওগুলো ছাড়, তোমাদের সেদিনকার বিখ্যাত তাজমহল বিষয়েই তো তোমরা ঠিকভাবে কিছু বলতে পারো না। তোমরা বলো, তাজমহল তৈরির খরচ চল্লিশ লক্ষ বা নব্বই লক্ষ বা এক কোটি কুড়ি লক্ষ বা সাত কোটি বা নয় কোটি সতের লক্ষ মুদ্রা। নির্মাণ করতে দশ বৎসর বা বারো বৎসর বা পনের বৎসর বা বাইশ বৎসর সময় লেগেছিল। নক্সাকার ইসা এফেন্দি বা আগমদ মেহেন্দিস বা অস্টিন দ্যঁ বুরদোঁ বা জেরেনিমো বা সাজাহান নিজেই ছিলেন। মমতাজের মৃত্যু ও তাঁকে সমাধিস্থ করার তারিখেরও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে সেই সময়ের গ্রন্থে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই, পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে আনুমানিক নির্ণয় মাত্র। তবে কি তাজমহল কোনোদিন নির্মিত হয়নি?

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। এক সমাজব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ দিয়ে অপর সমাজব্যবস্থা সঠিক ভাবে বিচার সম্ভব নয়। তোমাদের আধুনিক পরিকাঠামো দিয়ে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক পরিকাঠামোকে বিচার করা যায় না, কারণ তখন এখনকার মতো সাল-তারিখের উল্লেখ করে লেখার প্রচলন না থাকতেই পারে, এভাবে সময়ের গণনা পদ্ধতি না থাকতেই পারে। আর আমার বিষয়ে তোমরা যা থেকে জানতে পার তা তোমাদের এখনকার গঠনের ইতিহাস গ্রন্থ নয়, তা ইতিহাস অবলম্বনে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার্থে কাব্য ও পুরাণ। কাব্য ও পুরাণ হলেও, তাতে সাল-তারিখ না থাকলেও, এমন অনেক কিছু আছে যার দ্বারা এবং পারিপার্শ্বিক অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ, অন্যান্য গ্রন্থসকলে উল্লেখ ও বর্তমান অনুসন্ধানের দ্বারা মহাভারতীয় ঘটনা ও আমার বাস্তব ঐতিহাসিকতা মেনে নিয়ে তোমাদের বিদগ্ধজনেরা আমার সময়কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে। আমি তাঁদের দ্বারা প্রাপ্ত সময়কাল তুলে দিচ্ছি।

কোলব্রুড্ সাহেব— খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতক মহাভারতীয় যুদ্ধের সময়কাল, উইলসন্ সাহেব— ওই সময়কালের সঙ্গে সহমত। এল্‌ফিন্‌স্টোন সাহেব— ওই সময়কালের সঙ্গে সহমত। উইলফোর্ড সাহেব— ১৩৭০ খ্রিস্টপূর্ব। বুকানন্ সাহেব— খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক। প্রাট সাহেব— খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক। বেন্টলি সাহেব— খ্রিস্টপূর্ব ৫৭৫ আব্দ। জ্যাকিব সাহেব— খ্রিস্টপূর্ব ২,৫০০ আব্দ। ভিন্টারনিৎস্ সাহেব— খ্রিস্টপূর্ব ২,৫০০ আব্দ। ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী— খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক। ড. আলতেকর— ১৪০০ খ্রিস্টপূর্ব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় --- ১৪৩০ খ্রিস্টপূর্ব। সুনীল চট্টোপাধ্যায়— ১৫০০-৯০০ খ্রিস্টপূর্ব। গীতাশাস্ত্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ— ৯০০ খ্রিস্টপূর্ব। ড. অতুল সুর— ২৪০০ খ্রিস্টপূর্ব। ড. কারন্তিকর— ১৯৩১ খ্রিস্টপূর্ব। ড. দফতরি --- ১১৬২ খ্রিস্টপূর্ব। অধ্যাপক সেনগুপ্ত— ২৫৬৬ খ্রিস্টপূর্ব। ড. বৈদ্য, ড. আঠাওয়ালাস— ৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব। বালগঙ্গাধর তিলক— ৬০০০ খ্রিস্টপূর্ব। আচার্য বরাহমিহিরের গণনায় --- ২,৪৯৪ খ্রিস্টপূর্ব। আর্যভট্ট বরাহমিহিরের সঙ্গে একমত। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা মতে ৬৫৩ কল্যাব্দে যুধিষ্ঠির সিংহাসন আরোহণ করেন। বর্তমানে (২০১৭ খ্রি.) ৫১১৮ কল্যাব্দ চলছে। সেই হিসাবে ২৪৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ মহাভারতীয় ঘটনা তথা আমার সময়কাল। কহ্লনের রাজতঙ্গিনী একই কথা বলছে।

বিষ্ণুপুরাণ বলছে,

"..তেতু পরিক্ষীতে কালে মঘাস্বাশন দ্বীজত্তমম্।
তদা প্রবৃশ্চ কলিদ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।"

অর্থাৎ কলির দ্বাদশ শতবর্ষে অর্জুন পৌত্র পরিক্ষীতের সময়কাল। এবং সেই অনুসারে (৫১১৪-১২০০) ১৯০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু পূর্বে আমার সময়কাল। এবং বিষ্ণুপুরাণ আরো বলছে, "যাবৎ পরিক্ষীতো জন্মে যাবন্নন্দভিষেকম্। এতদ্‌বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশত্তরম্।।" অর্থাৎ পরিক্ষীতের জন্ম ও নন্দের রাজ্যাভিষেকের সময়কালের মধ্যে ১১৫০ বৎসরের পার্থক্য। নন্দ বলতে এখানে কোনো নন্দের কথা বলা হয়েছে তা পরিষ্কার নয়, তবে ঈঙ্গিত থেকে মনে হয় নন্দ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মহাপদ্মের কথাই হয়তো বলা হয়েছে। বা নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতাও হতে পারে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন মহাপদ্মই নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা, অনেকে বলে মহাপদ্ম নয় তার আগে নন্দ নামক মহাপদ্মের পূর্বজ ওই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর নামেই তাঁর বংশের পরবর্তী প্রজন্ম নামের সঙ্গে নন্দ যুক্ত করেছে। যাই হোক, এই নন্দের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক হলে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্ব আমার সময়কাল। শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌পুরাণ একই কথা বলে। এই সকল পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের পর্যালোচনা ও পরোক্ষ সূত্রের প্রমাণ দ্বারা সময়কালের ঐক্যমত্যে না পৌছলেও আমার ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করে। এর পরও যাঁরা অস্বীকার করবে তাঁদের বর্তমান হতে এক হাজার বৎসর আগের গোটা ইতিহাসকেই অস্বীকার করতে হবে, অবশ্য সবই তাঁদের মর্জি।

(শুভ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রকাশিত)

এই সময়

আলু ভাজায় সাপ

পুলিশের কাছে খবর ছিল। একদল দুষ্কৃতী পোট্যাটো চিপসের ক্যানে সাপ নিয়ে বিদেশে

বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছে। দুষ্কৃতীরা ক্যানগুলো স্মাগলিং এজেন্ট রডরিগো ফ্র্যাঙ্কোর হাতে তুলে দেওয়া মাত্র পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটি ক্যালিফোর্নিয়ার।

চাতাল

মদ খেয়ে মাতাল আর চা খেয়ে চাতাল। সম্প্রতি ইয়র্কশায়ার প্রবলেমস নামের একটি ওয়েবসাইট

জানতে চেয়েছিল চায়ের প্রকৃত রং কীরকম? হাজার হাজার উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের মত। দেখা যাচ্ছে হুজুগ পেলে শুধু বাঙালি নয়, কেউই ছাড়ে না।

ড্রোনে খাবার

গেরস্থকে খাবারের জোগান দেওয়া অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থাটির নাম

অনলাইন কাকা। তারা ড্রোনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে খাবার পাঠাতে চায়। অনুমোদন পেলে তারাই হবে উত্তর ভারতে ড্রোনের মাধ্যমে খাবার জোগানো প্রথম সংস্থা।

সমাবেশ -সমাচার

সিউড়ী সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরের ক্ষুদে পড়ুয়াদের সাফল্য

রাজ্য এবং জেলাস্তরে বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের পাইকপাড়ার সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় ৭টি গোল্ড মেডেল-সহ উত্তীর্ণ

হয়েছে যে সাতজন তারা হলো— অরিত্র মাহারা, ময়ূখ দাস, অনিকেত প্রামাণিক, অরিত্র সরকার, শৌনক মজুমদার ও সৌমি লাহা।

ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ অলিম্পিয়ার্ড পরীক্ষায় একটি গোল্ড মেডেল ও একটি সিলভার মেডেল বিজয়ী হয়েছে অরিত্র মহারা (স্বর্ণপদক) ও অরিত্র সরকার (রৌপ্য পদক)। এছাড়া বিজ্ঞান মঞ্চ জেলাস্তরের পরীক্ষায় সেরা পাঁজনের মধ্যে স্থান অধিকার করেছে যে তিন বোন তারা হলো চন্দ্রিমা বোস, তিয়াস মণ্ডল ও বৃষ্টি দাস।

সাইন্স অলিম্পিয়ার্ড (আইএসও) এবং ম্যাথ অলিম্পিয়ার্ড (আইএমও) পরীক্ষাতেও শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা নিজস্ব স্থান দখল করেছে।

হিন্দুস্থান সমাচারের পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরের উদ্বোধন

গত ২৭ জুলাই 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। এই উপলক্ষে কলকাতায় ভারতীয় ভাষা পরিষদে এই বহুভাষিক সংবাদ সরবরাহ সংস্থার এক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাংসদ তথা সংস্থার সভাপতি রবীন্দ্র কিশোর সিন্‌হা। প্রধান অতিথি ছিলেন মেজর জেনারালে কে কে গাঙ্গুলি।

প্রদীপ প্রজ্বলন, ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও বন্দে মাতরম্ গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সভাপতি শ্রী সিনহা হিন্দুস্থান সমাচারের গত ৭০ বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন, সত্যকে ধরে থাকার জন্যই নানা বিপর্যয় ও সরকারি নানা বাধা সত্ত্বেও এই সংস্থা দেশের অগ্রণী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলিও 'ফেক' ও 'পেড নিউজ'-এর ফাঁদে পা না দিয়ে সঠিক খবর পরিবেশনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ রাখেন 'নবোত্থান' বাংলা মাসিক-এর সম্পাদক তথা প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সিইও রাকেশ মঞ্জুল, সন্তোষ

এই সময়

রাজার কাছে চাকরি

আপনি কি চাকরি খুঁজছেন? তাহলে একটা সুখবর আছে। ব্রিটেনের রাজপুত্র উইলিয়াম,

তাঁর স্ত্রী কেট এবং ছোট রাজকুমার হ্যারি সিনিয়র কমিউনিকেশনস অফিসার পদে কর্মী নিয়োগ করতে চান। কাজ তেমন কিছু না, রাজপ্রাসাদের খবরাখবর ডিজিটাল আর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা। ভেবে দেখতে পারেন।

পণ্ডশ্রম

চারজনের দলটি সোনার দোকানে ঢুকেছিল চুরি করতে। তাদের মধ্যে দু'জন প্রায়

আধঘণ্টা ধরে কাচের শোকেস ভাঙার চেষ্টা করে গেল। কিন্তু কাচ ভাঙল না। ঘটনাটি মালয়েশিয়ার। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে দৃশ্যটি।

বাংলায় বন্যা

বাংলায় বন্যা পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার কারণে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। বীরভূম, হুগলী বর্ধমান

এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্লাবিত। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও চাষের ব্যাপক ক্ষতি হবে।

মধুপ, সুরজিত দাশগুপ্ত প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নতুন দপ্তরের ঠিকানা হলো— ডায়মন্ড চেম্বার, ব্লক বি, রুম নং- এইচ ৩, তৃতীয়তল, ৪, চৌরঙ্গী লেন, কলকাতা-৭০০০১৬। ফোন— ৯৭৪৮১৯৫৮৭৯/৯৮৩০৪৩২১৯৯।

বালুরঘাটে এবিভিপি-র কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

ভগিনী নিবেদিতার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী ও স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ তম বর্ষ উপলক্ষে বালুরঘাট নগরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে গত ৯ জুলাই বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. প্রশান্ত কুমার ধাইর। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে বালুরঘাটের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ২১ জন কৃতী পড়ুয়া যারা জেলা ও রাজ্যে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে তাদের মেডেল, ফুলের তোড়া, বই দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবিভিপি-র বালুরঘাট নগরের সহ-প্রমুখ নীলাদ্রিশেখর মুখার্জী।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নবগঠিত উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সমিতি

গত ২২-২৩ জুলাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের দু'দিন ব্যাপী বৈঠক জলপাইগুড়ি জেলায় বীরপাড়া ধর্মশালায় হয়ে গেল। বৈঠকে পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জীবেশ্বর মিশ্রর উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের নতুন

প্রান্ত সমিতি গঠিত হয়। এই নবগঠিত সমিতি হলো : সভাপতি— প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি— নিখিল চন্দ্র মজুমদার, ধীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার, সম্পাদক- উদয়শঙ্কর

এই সময়

দ্বীপের নাম

প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ওড়িশা

সরকার আউটার হুইলার দ্বীপের নাম তাঁর নামে রাখল। দ্বীপটি ওড়িশার উপকূল থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত। দ্বীপটির দেখাশোনা করে ভদ্রক জেলার চাঁদবলী তহশিল।

রাসায়নিক সারে রাশ

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিংহ জানিয়েছেন, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং কৃষকদের আর্থিক অবস্থা আরও ভালো

করতে সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি আরও জানান, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার হার ৮-১০ শতাংশ কমেছে। উৎপাদনও বেড়েছে ১০-১২ শতাংশ।

কাশ্মীরে ছাত্রবৃত্তি

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ছাত্রবৃত্তি প্রদান প্রকল্পে জম্মু-কাশ্মীরের ১৩,০১৪ জন ছাত্র উপকৃত হয়েছে। রাজ্যসভায় উত্থাপিত একটি প্রশ্নের

উত্তরে একথা জানান মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে।

সমাবেশ -সমাচার

সরকার, সহ-সম্পাদক— শ্যামসুন্দর শর্মা ও গৌরাঙ্গ তলাপাত্র, বজরঙ্গদল প্রমুখ— রতন তরফদার, সেবা-প্রমুখ— মঙ্গলময় মুখ্যার্জী, দুর্গাবাহিনী— শ্রীমতী সরস্বতী গৌড়-সহ মোট একুশজন। পরিষদের সাংগঠনিক ১৯টি জেলা থেকে ৫৬ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে একটি নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়। বৈঠকে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠক ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ।

সংস্কার ভারতীর নটরাজ পূজন

গত ৯ জুলাই গুরু পূর্ণিমা উৎযাপন অনুষ্ঠান নটরাজ পূজনের মাধ্যমে শুরু হয়, ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও বৈদিক চেতনার আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে গুরু পূজনের আরাধনায় ব্রতী হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা সোনারপুর গ্রামীণ শাখা। নটরাজ পূজন অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন (সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য) সুজিত চক্রবর্তী। প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালন করেন কবি-সাহিত্যিক শশাঙ্কশেখর মৃধা। সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী স্বস্তিকা রায় ও শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল। উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য অমিত ঘোষ দস্তিদার এক দীর্ঘ বক্তব্যে গুরু-শিষ্যের আদর্শগত দিক নির্দেশ করেন ও আধ্যাত্মিক চেতনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। সম্পাদক পরিমলেন্দু সরকার গুরু পূর্ণিমা বিষয়ে আলোকপাত করেন। সাহিত্যিক ও কবি শশাঙ্কশেখর ও পৃথ্বীশ পত্রনবিশ সামাজিক অবক্ষয়ের তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন। লেখক ও কবি অজয় হালদার স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমতী সুধারানি মৃধা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। আলি আকবর বাউল লোক গীতি ও বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সুভাষিত পাঠ করান ও সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠন সম্পাদক শেখর মণ্ডল।

গত কয়েকদিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ছে। দুর্গাপুর, পানাগড়, হাওড়া জেলার আমতা, উদয়নারায়ণপুর, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা চিড়ে, মুড়ি, গুড়, ওষুধপত্র, ত্রিপল, পানীয় জলের প্যাকেট নিয়ে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে সেবাকাজ করে চলেছেন। কলকাতা থেকে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি নানাভাবে বন্যাপীড়িতদের সেবায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

নীতীশ শুধু বিহার নয় সারা দেশের রাজনীতির গতিবিধিই পাল্টে দিলেন

অতিথি কলম

নীরজা চৌধুরী

অনেকেরই বিষয়টা চট করে মেনে নিতে হয়তো একটু বিস্ময়কর লাগবে যে নীতীশের মতো এমন একজন পোড়খাওয়া রাজনীতিক দুম করে লালুর সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কেন যোগ দিলেন। এ কাজের কোনো ব্যাখ্যা তাঁরা চট করে খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী ছিলেনই, এখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রী রইলেন। আমার মনে হয় লালু যতই তাঁকে নিজ স্বার্থে খুঁচিয়ে উত্যক্ত করুন না কেন নিজের মতো কাজ করার স্বাধীনতা যে তিনি হারিয়েছিলেন একথা বলা বেশি বলা হয়ে যাবে। উপরন্তু বেনামি সম্পত্তি জনিত নানান তদন্তে জড়িয়ে পড়া লালু ও তার পরিবার উত্তরোত্তর নীতীশের ওপরই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল।

বিজেপি কিন্তু হিসেব করেছিল ২০১৫ সালের লোকসভা তারা বিহার ও ইউপি থেকে যথাক্রমে ৩১ ও ৭১টির মতো বিপুল আসন দখলে এনেছিল। সেই হিসেবে ২০১৯ সালে তারা নীতীশের জন্য খুব বেশি সংসদীয় আসন ছাড়বে না। ২০২০ সালের বিহার- বিধানসভার নির্বাচনে বরঞ্চ তারা নীতীশকে বেশি আসন দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। কিন্তু ২০১৯-এর নির্বাচনে বিজেপি যদি প্রত্যাশামতো ভাল ফল করে তাহলে ২০২০-তে বিধানসভা নির্বাচনে তারা নিজেদের সাফল্যের নিরিখে কেন নিজেদের দলের থেকেই মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি করবে না? এটা প্রমাণিত রাজনীতি বহুক্ষেত্রেই প্রমাণিত নির্বাচনী সাফল্যের ওপর নির্ভর করে— অতীত প্রতিশ্রুতির ওপর নয়।

এই সেদিন অবধি ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তথাকথিত বিরোধী জোটের কাছে নেতা হিসেবে যে মুখটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখাত তাদের কাছেই নীতীশকুমার নামটি আজ একটি পরিহারযোগ্য কুশব্দে পরিণত হয়ে গেল। একে তো বিশ্বাসই করা যায় না! আরও আছে। নীতীশকে আজ নিজেই নিজের কথা ঢোঁক গিলে হজম করতে হচ্ছে— 'তিনি সঙ্ঘমুক্ত ভারত' চান।

অনুধাবন করলে দেখা যায় নীতীশের এই ঘর বদলের সম্ভাব্য তিনটি কারণ থাকতে পারে। কিছুটা যেন তিনি বাধ্য হলেন এমন একটা আভাস রয়ে যাচ্ছে। অনেকে বলেছেন তিনি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চিত্রনাট্যের দক্ষ কুশীলব হিসেবেই নিজের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অনুগামীদের কথায় নীতীশজীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার চরম মুহূর্তের দিনগুলিতে তাঁর কাছে প্রবাদ বাক্যের Devils the deef sea (শাঁখের করাত)-র মতোই অবস্থা হয়েছিল।

প্রথমত, নীতীশ ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন লালুর সঙ্গী হয়ে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর ভোটব্যাঙ্কটিকে হারাচ্ছিলেন। তাঁর প্রধান নির্ভরতা ছিল উচ্চবর্ণ, মধ্যবিত্তশ্রেণী, অ-যাদব পিছড়েবর্গ যার সঙ্গে তিনি মহাদলিতদের যোগ ঘটিয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি প্রথমেই রাষ্ট্রপতি পদের দলিত প্রার্থী কোবিন্দকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। ২০১৪ সালে তাঁর এই সমীকরণের ফলেই ভোটদাতাদের অনেককেই বলতে শোনা গিয়েছিল তারা লোকসভায় মোদীকে ভোট দেবেন কিন্তু বিধানসভার ভোট থাকবে নীতীশের জন্যই। বাস্তবেও ২০১৫ সালে তাই ঘটেছিল।

দ্বিতীয়ত, মহাজোটবন্ধনের মধ্যে থেকেও তাঁর মোদীর পক্ষে অবস্থান (নোটবন্দি, বেনামি সম্পত্তি আইন) জোটের চরিত্রেই একটি স্ববিরোধিতার সংকেত দিতে শুরু করে। পরিণতিতে প্রায় ১৮ জন এমএলএ যাদের অধিকাংশই যাদব ও মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। এমনটা এক সময় চাউর হয়েছিল তুখোড় রাজনীতিক লালু কংগ্রেস বিধায়কদের

> “নীতীশের এনডিএ-তে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে সূচিত হলো — বিশ্বনাথ প্রতাপ প্রবর্তিত জাতপাতের মণ্ডল রাজনীতির মৃত্যু। .... অতীতে উচ্চবর্ণেরাই হিন্দুত্বের পতাকাবাহী— এই ছিল সুবিদিত। আজ ওবিসি, অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দলিত ও মহাদলিতেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হিন্দুত্বের সমর্থক হয়ে উঠেছে। আজকের প্রধানমন্ত্রী মোদী বিজেপির চিরাচরিত সমর্থনের কেন্দ্রবিন্দুটিই সমূলে পাল্টে দিচ্ছেন।”

ফঃ ৪

বলেছিলেন তিনি অচিরেই জনতা দল (ইউ) থেকে বেরিয়ে আসা একটা অংশকে নিয়ে কংগ্রেসের বিকল্প সরকার গড়ার কথা ভাবছেন। কথাটা সত্যি কী মিথ্যে ছিল তা এখন আর বোঝার উপায় নেই, কেননা ক্ষমতা এমনই একরকমের আঠা যাতে আটকে গেলে সব ধরনের রাজনৈতিক বিদ্রোহই মিইয়ে যায়। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর কোনো বিধায়ক আজ স্বীকার করবেন না তাঁরা দলছুট হতে চেয়েছিলেন কিনা।

তৃতীয়ত, নীতীশ একটা জিনিস খুব ভালই উপলব্ধি করতে পারছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক মুখ্যমন্ত্রিত্বের ২০টি মাস এর মধ্যে তিনি সেভাবে বলার মতো কিছুই করে উঠতে পারেননি। বিহারের 'সুশাসনবাবুর' তাঁর যে যত্নে নির্মিত ভাবমূর্তি সেটি ক্রমশই মলিন হয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, লালু ও তাঁর উপমুখ্যমন্ত্রী পুত্র তেজস্বী-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওপর দুর্নীতির যে অভিযোগ— চার্জশিট, মামলা ইত্যাদি চেপে বসেছিল সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে তাঁর ঘোষিত দুর্নীতির সম্পর্কে 'শূন্য সহনশীলতার' প্রতিশ্রুতিই মিথ্যে হতে চলেছিল। অন্যদিকে বিজেপি সঠিকভাবেই দুর্নীতি কেলেঙ্কারির নিত্য নতুন বিষয় তুলে ধরছিল। এমন একটা পরিস্থিতিতে বাস্তবিক নীতীশের তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বকে সসম্মানে টিকিয়ে রাখাটা কিন্তু বেশ কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছিল। নীতীশ অবশ্যই একথা জানতেন যে বিজেপি-র সঙ্গী হলে ২০১৯-এর যে তথাকথিত কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে যোগদান তাতে ইতি পড়ে যাবে। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানতেন যে তিনি যদি তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতায় সুশাসন ফিরিয়ে আনতে পারেন সেক্ষেত্রে তাঁর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে ভোটব্যাঙ্কেও প্রভাব পড়বে। সেদিন লড়াই করার নতুন জমি পাওয়া যাবে। এই সূত্রে তাঁর মাথায় রয়েছে প্রস্তাবিত 'বিহার প্যাকেজের' কথা। কেন্দ্রের কাছ থেকে যদি তিনি সেই অর্থ জোগাড় করতে পারেন যা উন্নয়নের দিশায় খরচ করা হবে সেক্ষেত্রে তাঁর ভাবমূর্তি পুনরুজ্জ্বল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অন্যদিকে বিজেপিও সদাই চাইবে নীতীশের নেতৃত্বে সেখানে বিজেপির জোট সরকার উন্নয়নের কাজ করে ২০১৯-এর ভোটে যাতে পর্যাপ্ত সাফল্য দেখাতে পারে।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নীতীশের এই পালা বদলের অভিঘাত কী হতে পারে? ২০১৯ সালের জন্য 'মহাজোটবন্ধনের' যে স্লোগান তোলার ক্ষেত্রে নীতীশের নিজেরই বড় ভূমিকা ছিল সেই মোদী বিরোধী ঐক্য একটি মোক্ষম ধাক্কা খেল। বিরোধীদের ঘর সে অর্থে ছত্রখান। কেন্দ্রে শাসকদল এখন পরবর্তী দু'বছরে কী কী ভুল পদক্ষেপ নিতে পারে তার ওপরই বিরোধীদের একমাত্র ভরসা।

অবশ্যই, ২০১৯ ও ২০২০-তে বিহারে বিজেপির রাজনৈতিক সুবিধেজনক অবস্থানের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নীতীশের বিজেপিতে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতভাবে বিজেপিকে একটি মনোবৈজ্ঞানিক সুবিধে দেবে। দলের অনুকূলে একটি বাতাবরণ বা আগাম ইঙ্গিতের সূচনা করবে যে ২০১৯ সালে তারাই ক্ষমতায় ফিরছে। এর প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য আরও কিছু প্রাদেশিক দল যেমন দক্ষিণের এআইএডিএমকে এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে।

কেন্দ্রীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রিত্বের উচ্চাশায় পরিসমাপ্তির আরও একটি কারণ ইদানীং বিরোধী রাজনীতির পরিসরে নীতীশ তাঁর প্রাপ্য গুরুত্ব পাচ্ছিলেন না বলেই তাঁর ধারণা। আর একথাও তাঁর কাছে জলবৎ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল মোদীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ধোপে টিকতে পারবেন না। বাস্তবে বিহারের বাইরে তাঁর তেমন গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি হয়নি। সর্বোপরি নীতীশের মতো রাজনীতিতে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এটাও বুঝেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে আর সে দম নেই যারা বিরোধীদের এককাট্টা করে রাখতে পারবে।

আর একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নীতীশের এই এনডিএ-তে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে সূচিত হলো তা হলো— বিশ্বনাথ প্রতাপ প্রবর্তিত জাতপাতের মণ্ডল রাজনীতির মৃত্যু। গত ২৫ বছরে এর দাপট কম ছিল না। বিহারই ছিল এই রাজনীতির শেষ দুর্গ, কেননা আবার বড় কেল্লা উত্তরপ্রদেশ ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে পড়েছে। ২০১৫ সালে পিছড়ে বর্গরা জাতপাতের ভিত্তিতে লালু-নীতীশের পেছনে সমবেত হয়ে বিহারে মোদীর যাত্রাভঙ্গ করেছিল। অতীতে উচ্চবর্ণেরাই হিন্দুত্বের পতাকাবাহী— এই ছিল সুবিদিত। আজ ওবিসি, অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দলিত ও মহাদলিতেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হিন্দুত্বের সমর্থক হয়ে উঠেছে। আজকের প্রধানমন্ত্রী মোদী বিজেপির চিরাচরিত সমর্থনের কেন্দ্রবিন্দুটিই সমূলে পাল্টে দিচ্ছে। ■

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি

বন্যাদুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে আবেদন

চেক/ড্রাফ্ট নিচের দেওয়া নামে পাঠান ঃ

BASTUHARA SAHAYATA SAMITI

A/c. No. 103501000001235

Indian Overseas Bank

Sreemani Market Br.

IFS Code–IOBA-0001035

—ঃ পাঠানোর ঠিকানা ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণী,

কলকাতা-৭০০০০৬

PAN Ref–AAATB7422R

এই সেবাকাজে অর্থদান 80G(5)(vi) ধারায় সুবিধা প্রাপ্ত।

হিন্দু জাতীয়তা

চীন দেশের সরকারি খবর কাগজ থেকে জানা যাচ্ছে যে তারা ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিপদ দেখছে। নিজের দেশকে বাঁচানোর জন্য ভারতের সিকিম সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করছে, আবার অন্য দিকে ভারতের শত্রু তথা সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গ পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে প্রগাঢ় ভাবে। চীনের কাছে হিন্দু জাতীয়তাবাদের থেকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ গ্রহণযোগ্য বিকল্প।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস আওয়াজ তুলেছে (২১ জুলাই ২০১৭) বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে হঠাতে হবে। সময়সীমা দু'বছর। ভারতবর্ষে বিজেপি একমাত্র রাজনৈতিক দল যেটি হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। চীন এবং তৃণমূল কংগ্রেস একটি বিষয়ে একমত যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ তাদের পরম শত্রু এবং তার থেকে রক্ষা পাওয়া জরুরি। এ পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধে হয় না। অসুবিধা হয় এর পরেই। চীন হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ভয় পাচ্ছে নিজের দেশের কথা ভেবে। তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পাচ্ছে কার কথা ভেবে? ইসলাম সন্ত্রাসবাদের কথা ভেবে? তাদের বাঁচাতে? অথবা তৃণমূল কী ভারত বিরোধী চীনকে বাঁচাতে চাইছে? চীন যদি পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব গভীর করে তাহলে তৃণমূলের কি কিছু লাভ আছে? হিন্দু জাতীয়তাবাদকে হটিয়ে তৃণমূল যদি ভারতকেই বাঁচাতে চায়, সেই ভারতকে কি সে ইসলাম সন্ত্রাসবাদের কর্মভূমি করতে চায়?

হিন্দু জাতীয়তাবাদকে হটালে, ভারত আর ভারতই থাকবে না। হিন্দু জাতীয়তাবাদই এতকাল ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ রেখেছে, অন্যথায় এটি কবেই মিশর, ইরাক, ইরান বা পাকিস্তান হয়ে যেত। কোথায় থাকত তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার প্রার্থিত দোসর— লালুপ্রসাদ ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা? ডাঙ্গায় কি নৌকা চলে? হিন্দু জাতীয়তাবাদ আছে বলেই তো তৃণমূল কংগ্রেসও তার প্রার্থিত জোট সঙ্গীরা খেয়ে পরে বেঁচে আছে। চীন এবং পাকিস্তানে তৃণমূল কংগ্রেস, লালুপ্রসাদ, অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা নেই। এসব দেশে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হয় না।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ তৃণমূল কংগ্রেস ও তার জোট সঙ্গীদের গর্ভধারিণী মা। পিতৃপরিচয়ে হয়তো কখনও সন্দিহান হওয়া যায় কিন্তু মাতৃপরিচয় সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। একমাত্র পাগল ও উন্মার্গগামীরা গর্ভধারিণীকে অস্বীকার করে। তৃণমূল কি পাগল না উন্মার্গগামী যার বাক্য মাত্রই প্রলাপ?

তৃণমূল কংগ্রেস তো হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা শ্যামাপ্রসাদকেই অস্বীকার করে— যে শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে পশ্চিমবঙ্গই থাকতো না। তৃণমূল কংগ্রেস কোথায় থাকত? অবিভক্ত বাংলাদেশ তো পাকিস্তানেই যেত— যেখানে মুসাম্মত্ মমতা খাতুন হয়ে বেগম খালেদ জিয়ার পোষ্যবর্গের একজন হতে হোত।

পাগল বা উন্মার্গগামী কারুর কাছেই কাণ্ডজ্ঞান ও ইতিহাসের জ্ঞান আশা করা যায় না। আমরাও করি না। হাওয়াই বাজী তীব্র আলো বিকরণ করে অনেক উচ্চে উঠতে পারে, কিন্তু তা কোনো গৃহ আলোকিত করে না। আমরা হাওয়াই বাজীর খোঁজে নাই। আমরা উজ্জ্বল বিজলি বাতির খোঁজে আছি— যা একমাত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদই দিতে পারে।

—অমলেশ মিশ্র।

চাঁদসওদাগরের সত্যবাদিতা

বাংলা সাহিত্যের বীরনায়ক চাঁদসওদাগর সত্যের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তা আজ দুর্লভ। চাঁদ যা সত্য বলে জেনেছে, সেটাই সে অকপটে বলেছে। এটাই তার বিরাট অপরাধ। চাঁদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য, তাই জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। এ শাশ্বত ভাবনায় চাঁদ অটল। সততা ও নিষ্ঠাকে সম্বল করে, সে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তার এ সত্য স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় রাজশক্তি তথা মা-মনসা। কিন্তু চাঁদের ছিল প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যহীনতা। চাঁদ মনসাকে সহ্য করতে না পারাটাই হলো সত্যের পথে রাজশক্তির বিরাট বাধা। সত্যনিষ্ঠ চাঁদ এ 'যুগসত্য' বুঝতে পারে না, ফলে চাঁদের সেই শাশ্বত ভাবনা ধাক্কা খায়। চাঁদের এ ভাবনা বদলে দিতে আসরে নামে মনসার প্রতিনিধি আচার্য বল্লভ। এই বল্লভই ছিল চাঁদের এক সময়ের গুরুদেব। ফলে মনসার কূটকৌশল সার্থক হয়। যুগে যুগে বুদ্ধিজীবীগণ শাসকদলের শৃঙ্খলাবদ্ধ বেতনভুক কর্মীই হয়। বাধ্য হয় রাজশক্তির সঙ্গে আপোশ করতে।

চিঠিপত্র

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'-র মতো ঋষিবাক্যকে ঢাল করে বাঁচতে চায়। তবুও সত্য টিম টিম করে হলেও জ্বলে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

রাজ্যে অরাজকতা

দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে সমতলের বসিরহাট-বাদুড়িয়ায় অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। শান্ত পাহাড়ে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু হয়। বসিরহাট-বাদুড়িয়ায় গোষ্ঠী সংঘর্ষের জন্য তৃণমূল নেতৃত্বকে দায়ী করা যায়। অযথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। বিজেপির ওপর দোষারোপ করেছেন। কোনো বিরোধী নেতা-নেত্রীকে ঘটনাস্থলে যেতে বাধা সৃষ্টি করেছেন। আর রাজ্যের যে-কোনো ঘটনার জন্য কেন্দ্রের দোষারোপ করা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। রাজ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল বিজেপির বাড়বাড়ন্তে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। রাজ্যপালের ভূমিকার বিরোধিতা করতে পর্যন্ত ছাড়েননি তৃণমূল নেত্রী।

এছাড়া নিজেদের গোষ্ঠী লড়াইকে অনেক সময় ধর্মীয় রঙ লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্লোগান দিয়ে সঙ্ঘ পরিবারের ওপর দোষারোপ করতেও পিছপা হন না তৃণমূল নেতৃত্ব। অর্থাৎ সামাজিক একতা ও সংহতির প্রশ্নটিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, জনতার ভাবাবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে আন্দোলনের ছুতোয় রাজনৈতিক ফয়দা তোলাটা বড় করে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের সচেতন মানুষ নানা অরাজকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করেছে। তাই জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। আর তাতেই তৃণমূল নেতৃত্ব যেন দিশেহারা হয়ে পড়ছে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে

এস. কে. বসু

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি। মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবিতে সারা বাংলায় সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। মুসলিম লিগের তীব্র সাম্প্রদায়িক শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার হিন্দুরা তখন ত্রাহি মধুসূদন ডাকছেন। রব তুলেছেন বাংলার কৃষ্টি রক্ষা করো, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য রক্ষা করো। এদিকে ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে জিন্না ও মুসলিম লিগের দাবি মেনে তাঁদের তীব্র সাম্প্রদায়িক দাবির কাছে মাথা নত করে দিল্লির সিংহাসনে বসার জন্য উদগ্রীব নেহরু গোটা বাংলা তাদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। এই সময় বাংলার হিন্দুদের বাঁচানোর জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী গোটা বাংলাকে পাকিস্তানে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি দাবি করলেন বাংলার ৪৫ শতাংশ হিন্দুদের বাঁচার জন্য অবিভক্ত বাংলার হিন্দুপ্রধান অংশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাঁর সেই দাবি মেনে বাংলা ভাগ হয়ে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয় যাতে বাংলার হিন্দুরা সেখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে তখন হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮২ শতাংশ।

দেশভাগের ফলে অবিভক্ত বাংলার ৭০ শতাংশ ভূমি মুসলমান শাসনে চলে গেছে। সেখান থেকে উৎখাত হয়ে হিন্দুরা প্রায় সব পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে। বাকি ৩০ শতাংশ ভূমি নিয়ে গঠিত এই ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের পাল্লায় পড়ে এখন যায় যায় অবস্থায়। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চলছে দৃষ্টিকটু নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ। প্রথমে পথ দেখিয়েছিল কমিউনিস্টরা। সেই একই পথ ধরে মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেস আরও উগ্র তোষণনীতি চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় ইসলামি রাজ্যে পরিণত করে ফেলেছেন। মুসলমান পরবের জন্য সরকারি ফতোয়ায় এখানে নির্দিষ্ট দিনে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যেতে হয়েছে। তেহট্টের স্কুলে সরস্বতী পূজা করতে চাওয়ায় এক ছাত্রীকে পুলিশের লাঠি খেতে হয়েছে, প্রগতিশীল লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, রামধনু হয়েছে রংধনু, মা-বাবা হয়েছে আম্মু-আব্বু, জলের বদলে পানি হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। স্থানে স্থানে শঙ্খধ্বনি ও আলপনা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মালদার মৌলবিদের ফতোয়ায় মেয়েদের ফুটবল খেলা বন্ধ করা হয়েছে। কলকাতায় মৌলানা আজাদ কলেজের হোস্টেলে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের মূর্তি ভাঙার তোড়জোড় চলছে। দে গঙ্গা, ক্যানিং, উস্তি, নলিয়াখালি, ধূলাগড়, কালিয়াচক, বাদুড়িয়া-বসিরহাট ইত্যাদি জায়গায় হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রশাসন নির্বিকার। এখানে ওখানে দুর্গা ও কালিমূর্তি ভাঙা তো চলছেই, নন্দীগ্রামে স্কুলে ফেজটুপি পরে আসতে নিষধ করায় হেডমাস্টারকে চরম হেনস্থা করা হয়েছে। আর ওদিকে মুসলমানদের জন্য চলছে ঢালাও সরকারি সাহায্য। প্রায় ১০০ শতাংশ মুসলমানকে ও বি সি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ফলে ও বি সি ভুক্ত হিন্দুদের উপর কোপ পড়েছে। মুসলমান মেয়েদের জন্য আলাদা হোস্টেল, মুসলমানদের জন্য টাকা আলাদা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি চাকুরিতে ওবিসি কোটার মুসলমানদের জন্য রিজার্ভেশান করা হয়েছে। ইমাম মোরজেমদের জন্য মাসিক ২৫০০/- টাকা ভাতা বরাদ্দ হয়েছে (সম্প্রতি তা বাড়িয়ে ১০,০০০/- করার দাবি উঠেছে) মুসলমানদের জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। হজ যাত্রীদের জন্য কলকাতার আশেপাশে একাধিক হজ হাউস তৈরি হয়েছে, হজ যাত্রার জন্য ঢালাও আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে ইত্যাদি। এক কথায় যে পশ্চিমবঙ্গ নামে ক্ষুদ্র ভূখণ্ড মুসলিম লিগের হাতে নির্যাতিত বাংলার হিন্দুদের জন্য গঠিত হয়েছিল 'ধর্মনিরপেক্ষদের' পাল্লায় পড়ে তাও আজ ইসলামিস্থানে পরিণত হতে চলেছে। এখানে মুসলমানদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। বাংলা ভাগের সময় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৮ শতাংশ, এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৭ শতাংশ। আর হিন্দু ছিল ৮২ শতাংশ, তা এখন কমতে কমতে ৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, পূর্ববাংলা থেকে প্রায় দেড় কোটি হিন্দুর পশ্চিমবাংলায় চলে আসা সত্ত্বেও। তাঁরা না এলে এতদিন পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হতো— 'ধর্মনিরপেক্ষতার' স্বাদ চিরকালের মতো ঘুচে যেত। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জেলা ইতিমধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়েছে।

নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা, বীরভূম, বর্ধমান ও হাওড়া জেলাগুলি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পথে। এসব জায়গার গ্রামাঞ্চল এবং শহরের কোনো কোনো অঞ্চল থেকে হিন্দুরা পালিয়ে যাচ্ছে। খাস পশ্চিমবঙ্গে আজ হিন্দুদের এই দুরবস্থা, আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার জন্য মুসলমানদের গর্ব অনুভব করতে বলেছেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তা তো সত্যই গর্বের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হলে তাঁর গদি থাকবে তো?

এককথায় ক্রমাগত মার খেতে খেতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তারা এখন নিছক আত্মরক্ষার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আর তাই এখানকার যাবতীয় সংবাদপত্র এবং তামাম মিডিয়া এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল গেল গেল রব তুলেছেন।

এখন হিন্দুরা ঘুরে দাঁড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা নিজেকে সাচ্চা হিন্দু বলছেন। তাঁর পারিষদ বর্গ এখন কেউ হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন, কেউ যাগযজ্ঞ করছেন কেউবা তারাপীঠে পুজো দিচ্ছেন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। হিন্দুরা এখন ওসবে ভুলবে না। পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের একটা বড় অংশ এক সময় সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে উৎখাত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা আর দ্বিতীয় বার উদ্বাস্তু হতে চান না। পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিস্থানে পরিণত হওয়া তাঁরা রুখবেনই। ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউড়ে তা রোখা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যেন খেয়াল রাখেন পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়েছে হিন্দুদের বাঁচার জন্য, মুসলমানদের প্রতি মোহগ্রস্ত হবার জন্য নয়। ▮

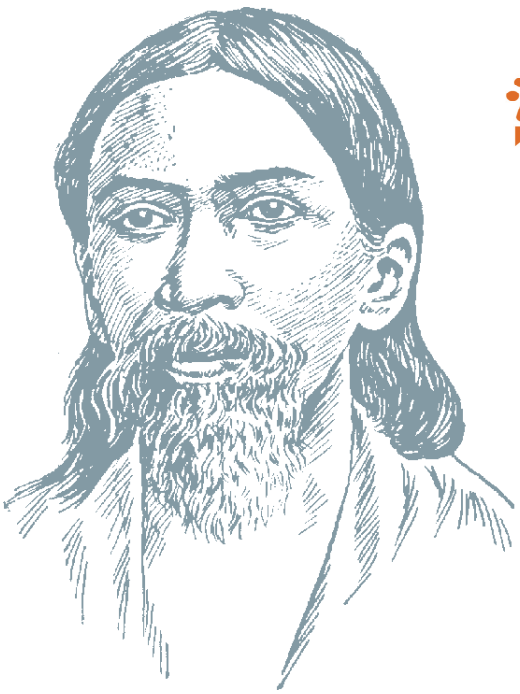

শ্রীঅরবিন্দ ও ভারতের পুনর্জাগরণ

গৌতম দত্ত

স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে আজকের এই গৌরবোজ্জ্বল দিনে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকাকে উন্মুক্ত নীল আকাশে উড্ডীয়মান দেখে ভারতবাসী হিসেবে আমাদের হৃদয় আনন্দ ও গর্বে ভরে ওঠে। যে সকল স্বাধীনতা সেনানী উপনিবেশিকতা ও বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এই দিনে তাঁদের সেই দুর্জয় সাহসিকতা প্রদর্শন, আত্মত্যাগ ও দেশ-জাতির প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য। এই দিনটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, উপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি লাভ করে যেদিন স্বাধীন ভারত অগ্রগতির পথে নবযাত্রা শুরু করেছিল সেই একই দিনে জন্মেছিলেন ভারতের এক মহান সন্তান শ্রী অরবিন্দ।

জাতীয় লক্ষ্য পূরণে ভারতের এই অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছিল এমন একটি বিশেষ দিনে যা জাতির ভাগ্যে পূর্বনির্ধারিত— ১৫ আগস্ট দিনটি ছিল তাঁরও জন্মদিন। শ্রীঅরবিন্দের সাতাত্তরতম জন্ম দিবসে ভারত উপনিবেশিক অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হলো। সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে ভারতের নব অভ্যুত্থান শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নকে সাকার করেছিল। তাঁর ভারতের পুনরুজ্জীবনের ভাবনা প্রতিফলন ঘটিয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৭ সালের এই দিনে তিনি এক বাণীতে বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে এ জিনিসটি নিশ্চয়ই প্রীতিকর যে, যে দিনটি আমার স্মরণীয় ছিল আমার নিজের জন্মদিন হিসেবে, আমার জীবন-সাধনা যারা গ্রহণ করেছে তারাই যে-দিনটির উৎসব করে এসেছে, ঠিক সেই দিনটি আজ অর্জন করেছে এক বিপুল অর্থ।'

স্বরাজ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায় ও সমতার মতো সার্বজনীন-মূল্যবোধগুলির ভিত্তি যাঁরা স্থাপন করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। যিনি পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরিতে দীর্ঘ প্রায় চার দশক আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবিষ্ট থেকে মহাযোগী শ্রী অরবিন্দ নামে পরিচিতি লাভ করেন। স্বাধীনতার উদয় সেদিন নবভারত গড়ার নতুন সুযোগ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল যে নবভারতের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ বহুকাল আগে। ১৯৪৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে তিনি একটি বেতারবার্তা দেশবাসীর উদ্দেশে প্রেরণ করেছিলেন। তামিলনাড়ুর ত্রিচিনোপলি বেতারকেন্দ্র থেকে যখন তাঁর সেই বাণী সংবলিত বেতারবার্তা সম্প্রচারিত হয় তখন তিনি পণ্ডিচেরিতে। সেই বিশেষ বার্তায় তিনি বলেছিলেন, '১৫ আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এ দিনে ভারতে একটা যুগের শেষ হলো, আরম্ভ হলো নতুন যুগ। কিন্তু কেবল আমাদের জন্যই নয়, এশিয়ার জন্য, সমগ্র জগতের জন্য এদিনের অর্থ রয়েছে। সেই অর্থ হলো নেশন গোষ্ঠীর মধ্যে একটা নতুন নেশন-শক্তির আবির্ভাব, অফুরন্ত যার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, মানবজাতির রাষ্ট্রীক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ভবিতব্য গঠনে যার থাকবে বৃহৎ অবদান।' সেই নতুন নেশন-শক্তি বলতে তিনি তখন ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

তিনি বলতে চেয়েছিলেন, ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে এশিয়ার যে সকল রাষ্ট্র একদিন ক্রমানুসারে স্বাধীনতা অর্জন করবে, সে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারত একমাত্র নতুন রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। যে ভারত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিকতা প্রসারের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তিনি ভারতের সার্বিক উন্নয়নের ভাবনার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, আমরা যদি মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তুলতে চাই তাহলে শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, পরিষেবা, উৎপাদনশীলতা ও সৃষ্টিধর্মী ইত্যাদি জাতীয় জীবনের প্রতিটি কাজে প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তবে ক্ষমতা ও সম্পদের মতো জাগতিক লাভগুলিকে অহংকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে না দেখে আত্মস্বার্থের বাইরে বৃহত্তর আদর্শ ও সেবার কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। শ্রী অরবিন্দ ভবিষ্যৎ ভারতকে আরও একটি বাণী শুনিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, ''আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলে এসেছি যে ভারতের অভ্যুত্থান, তার নিজের স্থূল স্বার্থ সেবার জন্যে নয়, কেবল নিজের প্রসার, মহত্ত্ব, শক্তি, সমৃদ্ধিলাভের জন্য নয়— যদিও এসকলকে অবহেলা করা তার উচিত হবে না— তার জীবনধারণ হবে ভগবানের জন্য, জগতের জন্য, সকল মানবজাতির সহায় ও নেতারূপে।' তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দূরদর্শী ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে যখন ২০১৪ সালে পৃথিবী জুড়ে যোগ শিক্ষা প্রসারণের লক্ষ্যে ভারতের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রথমবারের মতো 'বিশ্ব যোগ দিবস ঘোষণা করে। সেদিন বিশ্বজুড়ে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনে ভারত উল্লেখযোগ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। যোগ অনুশীলন ও চর্চা প্রসারে ভারত নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের একশ সাতাত্তরটি দেশকে সমবেত করেছিল যারা তার উত্থাপিত প্রস্তাবের সপক্ষে সমর্থন দিয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষকে নিয়ে গর্ব অনুভব করতেন এবং তিনি বিশেষভাবে উদ্গ্রীব ছিলেন মানবজাতির ভবিষ্যৎ ও তার উন্নতি সম্পর্কে। সেজন্য তিনি একসময় রাজনীতির সংস্রব ছেড়ে দিয়ে বৈষয়িক সম্পত্তি ও লাভজনক জাগতিক বিষয়গুলি যেমন— অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা সর্বোপরি ভোগ বিলাসের মোহ ত্যাগ করে বিলেত ফেরত আই সি এস (পরীক্ষায় সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হলেও একমাত্র ঘোড়ায় চড়ায় ব্যর্থতার কারণে অকৃতকার্য হয়েছিলেন) তথা স্বদেশচেতা এই বরণীয় ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন মানবজাতির সেবায় ও কল্যাণে। তাঁর সেবাধর্মী মনোভাব, শান্তি ও সদ্ভাবনার ক্ষেত্রে উদার নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি তাকে পরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। এমনকী অনুসরণযোগ্য বিশ্বের একজন মহান ব্যক্তি হিসেবেও তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং এই মর্মে প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। শ্রীঅরবিন্দ ব্রিটিশরাজের বশ্যতা থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে ভারতের জাগরণ চেয়েছিলেন এবং সংহতি স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, ভারত গড়ার লক্ষ্যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যাতে প্রত্যেকেই আমাদের নিজস্ব পন্থায় অবদান রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। যে ভারত আমরা গড়তে চাই সে ভারতের স্বরূপ কী হবে তারও কতকগুলি দিক নির্দেশনা তিনি বলে দিয়েছিলেন।

তিনি চেয়েছিলেন, এমন একটি ভারত যে ভারত হবে ন্যায়, সংহতি ও মনুষ্যত্বের প্রতীক। তিনি আশা করেছিলেন, এমন একটি সমৃদ্ধশালী ভারত যেখানে রাষ্ট্রীয় একতা ও সৌভ্রাতৃত্ব বিরাজমান। যেখানে কর্মে আগ্রহী ব্যক্তি মানুষ নিরবচ্ছিন্ন উপায়ে একতাবদ্ধ হয়ে সকলের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ও বৃহত্তর স্বার্থে সেবাপরায়ণ মনোভাব নিয়ে কর্মে নিযুক্ত থাকবে। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত। বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ এড়িয়ে সংগঠিত বিকশিত ভারত যেখানে একটা ঐক্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে। সেই ভারতের গতি হবে মন্থর ও শঙ্কিত গতির পবিবর্তে ক্ষিপ্র ও নির্ভীক গতি। তিনি নিজেই একসময় বলেছেন, ভারত স্বাধীন, কিন্তু একত্ব সে লাভ করেনি। তাকে যে করেই হোক সেই বিচ্ছিন্নতা ও খণ্ডতা দূর করতে হবে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, ভারতকে নিজত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা, বিজ্ঞান আবিষ্কার এবং ধর্ম-সংস্কৃতি চর্চায় স্বকীয়তা অটুট রাখতে হবে। সেই সঙ্গে ভারতের সনাতন আদর্শ— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'— এই তত্ত্বটি কার্যে পরিণত করার মধ্য দিয়ে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এক অভিন্ন আত্মার জাতীয়তার বন্ধন গড়ে তুলে বিশ্বমৈত্রী স্থাপনার ভিত্তি সুদৃঢ় করার কথাও তিনি বলেছিলেন। আর চেয়েছিলেন, জগৎকে ভারত তার আধ্যাত্মিক বিদ্যাদান করবে।

শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষকে জননী স্বরূপ মনে করতেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, দেশ গঠনের কাজে চাই নিরলস উদ্যম ও ভালোবাসা। আর চাই সৃজনশীলতা এবং সম্মিলিত শক্তির সমাবেশ। মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার বন্ধনে সকলকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে বিভেদ-বিচ্ছেদ এড়িয়ে। ভারতবাসী হিসেবে আমাদের পরিচিতি থেকেই এই ভালোবাসার প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের ভাবনা ও সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে তার নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। অর্থাৎ আমরা যেমনভাবে গড়ে তুলব স্বদেশকে সেই রকরমই রূপ পাবে। এক কথায় ধ্বংসাত্মক রাষ্ট্রবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সৃজনশীল জাতীয়তাবোধের পথ অনুসরণের কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন রাষ্ট্রের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে। তিনি জাতি গঠনের কাজে যুবশক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করার সার্থক প্রেরণাদায়ক দেশপ্রেমিক ছিলেন। দেশের যুব ও ছাত্র সম্প্রদায় বরাবর তাঁর কাছে আলাদা গুরুত্ব আকর্ষণের মধ্যমণি ছিল। ১৯০৮ সালে তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। বিদায়ী সভায় ভাষণদানকালে ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, 'আমি ফিরে এসে দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ধনী হয়ে উঠেছ। এই ঋদ্ধি তোমাদের নিজেদের জন্য নয়, বরং তা হবে তোমাদের সম্পদ দিয়ে দেশজননীকে ঋদ্ধ করে তোলা। আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মহান হয়ে উঠেছ, তা এই মহত্ত্ব তোমাদের নিজেদের জন্য নয়, তোমাদের গর্বকে পুষ্ট করার জন্যও তা নয়, বরং তা হবে ভারতবর্ষকে মহান করে তোলার জন্য, যাতে সে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে মস্তক উন্নত করে দাঁড়াতে পারে।'

শ্রীঅরবিন্দ এক সময় বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। সে কলেজে তিনি একজন গুণী ও ছাত্রদরদি শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক তথা জাতি গঠনের কারিগর ছিলেন বলেই মানবজাতির কল্যাণে ও তার সার্বিক বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাঁর শিক্ষাদর্শনে। তাঁর প্রণীত শিক্ষাতত্ত্বে যে উপাদানগুলি সন্নিবেশিত করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো--- আত্মা ও মন যোগ সমন্বয়, দিব্যজীবন, অতিমানস, বিবর্তন মানব ঐক্যের আদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি, অহং বর্জন ইত্যাদি। তিনি বলতে চেয়েছেন, শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুর জীবনে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত

সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং জীবনব্যাপী এই প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি তাঁর শিক্ষাভাবনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন— শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা, সর্বোপরি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের উপর। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ও তার সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ। ব্যক্তির চেতনার উৎকর্ষ সাধন, সমষ্টি তথা সমাজের সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য থাকা দরকার যে শিক্ষার ভিত্তি হবে আধ্যাত্মিকতা। সেই লক্ষ্যে তিনি যোগশিক্ষা প্রসারণ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের ভিত্তিতে মানব চেতনার রূপান্তর ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে জীবনধারায় পরিবর্তন আনয়নের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সে শিক্ষাই একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা যে শিক্ষা ব্যক্তি মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত করে দিব্যমানবে রূপান্তরের সহায়তা করে। ব্যক্তি মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যমে সমষ্টির উন্নয়নের কথাও তিনি বলেছেন। কারণ, ব্যক্তির বিকাশ ও তার চেতনার রূপান্তর না হলে সমাজের উন্নতি হবে না, সমাজের উন্নতি হবে না। সেজন্য তিনি এমন শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন যে শিক্ষার মাধ্যমে চেতনার বিকাশ, শৃঙ্খলাপরায়ণ মানসিকতা, পরিচ্ছন্নতাবোধ, শুদ্ধতা, সত্যনিষ্ঠা, বিনয় ইত্যাদি মানবিক গুণসমৃদ্ধ মানুষকে দিব্যমানব রূপে গড়ে তোলা যায়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ থোমাস শিল্ডের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, রক্তমাংসের মানুষটিকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন করে তুলতে হবে। পাশ্চাত্যের এই শিক্ষাবিদের মতো সেই একই কথা বলেছেন প্রাচ্যের ভাববাদী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর ভাষায়, ব্যক্তি মানুষটিকে দৈবশক্তি সম্পন্ন তথা ভগবতমুখী করে তুলতে হবে যাতে সে পাশবিক যন্ত্রে পরিণত না হয় কিংবা পশুশক্তির দিকে পরিচালিত না হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মনুষ্যসৃষ্ট পাশবিক যন্ত্রের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরমাণু অস্ত্র যা পাশবিক শক্তিরূপে মানবসভ্যতা ধ্বংস ও বিনাশের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। যার জন্য এর ভয়াবহতার কথা ভেবে যুদ্ধ উন্মাদনা, অশান্তি ও পারস্পরিক সংঘাত এড়াতে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এগিয়ে এসেছে। বিশ্বের ছয় ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র যেমন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়া অতি সম্প্রতি সহমতের ভিত্তিতে ইরানের সঙ্গে পরামাণু অস্ত্র প্রসার রোধে পারস্পরিক সমঝোতায় আবদ্ধ হয় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এমনকী, একসময় বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী তথা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আব্দুল কালাম যিনি ভারতের কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাপনা এবং ১৯৯৮ সালে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনিও পরে ধ্বংসের বিপক্ষে শান্তি-সংহতির সপক্ষে অবস্থান নিয়ে নিজেকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্বগড়ার প্রচারে যুক্ত করেছিলেন। কারণ, তিনি মনে করতেন, 'পারমাণবিক শক্তি তখন অমঙ্গলের, যখন তা মানব উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধবংসের কাজে ব্যবহার করা হয়।' যে পারমাণবিক শক্তি অশুভের প্রতীক রূপে যুদ্ধ উন্মাদনা ও সংঘাত প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে, রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এবং শান্তি স্থাপনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তা কখনো কল্যাণদায়ক হতে পারে না। যার ফলে পরমাণু অস্ত্র সংবরণের স্বপক্ষে একজোট হয়েছে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলি। এরমধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বমৈত্রী ও শান্তি স্থাপনার বিষয়ে রাষ্ট্রগুলি বদ্ধপরিকর যা এক সময় শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যাশা করেছিলেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রগুলির এই প্রয়াসে বাস্তবে শ্রীঅরবিন্দের ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা, তিনিও একসময় উপলব্ধি করেছিলেন, 'আসুরিক শক্তির জয় হওয়া মানেই জগতের মানুষকে অশুভ শক্তির অত্যাচারের দাস হয়ে থাকতে বাধ্য করা, তাতে মনুষ্য জগতের আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ধারা একেবারে থেমে যাবে। আর তাতে কেবল ইউরোপ নয়, সমগ্র এশিয়া এবং সেই সঙ্গে ভারতও তাদের দাস হয়ে থাকবে।'

এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাই আরও একটি উপদেশবাণী শুনিয়েছিলেন। তিনি তামসিকতা ও অহংকেন্দ্রিক মানসিকতা বর্জন করতে বলেছেন। কারণ, আসুরিক শক্তির লক্ষণ হলো ধ্বংস, বিনাশ ও রক্তপাত যার উদ্ভব ঔদ্ধত্য এবং অহংকার থেকে। এই ঔদ্ধত্য থেকে তাঁর মতে, দুর্বলতা, কুসংস্কার, মনের সঙ্কীর্ণতা, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কলহের সৃষ্টি হয়। তাই তিনি অহং সর্বস্ব মানসিকতা ত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধি, বৃহত্তর মানবজাতির সেবায় ও কল্যাণে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এক অভিন্ন আত্মার আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। যার মূল সুর নিহিত রয়েছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' তত্ত্বের মধ্যে।

(শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090

9748978406

বৃক্ষরোপণে মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

বর্ষা এল। এই ঋতুতে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ হয়ে থাকে। কারণ প্রাকৃতিকভাবে বৃষ্টির জল চারাগাছকে খুব তাড়াতাড়ি পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় মহিলারা এই সময় বাড়ির আশে-পাশে গাছপালা লাগিয়ে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই মহিলারা প্রকৃতির সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গ, সেজন্য গাছ লাগানো থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার দেখাশুনা করার মতো কাজ তাঁরা করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁদেরও একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ভুল সিদ্ধান্ত এবং অজ্ঞানতার জন্য কিছু বিদেশি

গাছপালা আমাদের দেশের মাটিতে পোঁতা হয়েছিল যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এইসব বিদেশি গাছপালা আমাদের পরিবেশ ও অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলেছে। বিশাল, বিস্তৃত বনভূমি থাকা সত্ত্বেও আজ আমাদের দেশের আশানুরূপ অর্থনৈতিক লাভ হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বৃক্ষরোপণের আগে আমাদের সঠিকভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে কোন গাছটা ভাল, আর কোনটা খারাপ। কিছু বিদেশি গাছ আছে, যা প্রকৃতি এবং পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বর্তমানে আমাদের দেশে ১৭৩টি এমন গাছ আছে, যার মধ্যে আমেরিকা থেকে আনা হয়েছিল ১২৮টি প্রজাতি। সমগ্র বিশ্বে ১০০টি সব থেকে সাংঘাতিক, কুপ্রভাব বিস্তারকারী গাছপালার মধ্যে ১৯টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া রয়েছে।

অজ্ঞতার জন্য অনেক সময় আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। যেমন, এক মহিলা কচুরিপানার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে বিদেশ থেকে ভারতে নিয়ে আসেন। এখন তার কুপ্রভাবে ভুগছি আমরা। সেইরকম অনেক গাছ আমরা জমির ধারে ধারে বা বাগান সাজানোর জন্য বা টবে লাগিয়ে থাকি। অজান্তে আমরা এই ভুল কাজের জন্য পরিবেশ ও প্রকৃতির ভীষণ ক্ষতি করে ফেলি। এগুলি পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, কৃষিজমিতে ফসলের মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ফসলেরও লোকসান করে থাকে। এই ধরনের ক্ষতিকারক বিদেশি গাছপালার মধ্যে ইউক্যালিপটাস,সুলবুল, পাইন, বিলিতি বাবুল, পার্থেনিয়াম, অকেসিয়া, জলকুম্ভী, আরজীক্ষেপন মেক্সিনামা (সত্যানাশী), ইউপেটোরিয়াস, বনতুলসী, সিলেমিয়া ইত্যাদি। ১৮৭০ সালে ব্রিটিশরা আমাদের দেশের জমির কাদা শুকানোর জন্য ব্যাপকহারে ইউক্যালিপটাস গাছ এনে লাগাতে শুরু করেছিল। এই গাছ মাটি থেকে প্রচুর জল নিয়ে তা বাষ্পীভূত করে। ফলস্বরূপ আমাদের দেশের মাটির জলস্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। সেইরকম, দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাইনগাছ লাগানোও ব্রিটিশদের স্বার্থপরতার পরিচয়। পাইনের ঝাড় দিয়ে ওরা জাহাজ বানাতো। সমুদ্রের জলেও বহুদিন টিকতো ওই পাইন গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি জাহাজ। পাইন গাছ অন্য গাছকে তার আশে পাশে বাড়তে দেয় না। ফলস্বরূপ জঙ্গলে ফলের গাছ শেষ হয়ে যাচ্ছে। জানোয়ারেরা খাদ্য না পেয়ে লোকালয়ে উপদ্রব শুরু করেছে অথচ এর জন দায়ী কে?

পার্থেনিয়াম ১৯৫৫ সালে আমেরিকা এবং কানাডা থেকে আমদানি করা গমের সঙ্গে আমাদের দেশে এসেছে। এগুলি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে আমাদের ত্বক এবং অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এখন লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে ছড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রেও ক্ষতি করে চলেছে।

সুলবুল মেক্সিকো থেকে আনা হয়েছিল, যা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশীয় প্রজাতির গাছ আশেপাশে বাড়তে দেয় না। অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা অকেসিয়াও একই চরিত্রের। এদিকে জ্বালানি সমস্যার সমাধানের জন্য ১৮৭০ সালে বিলিতি বাবুল আমাদের দেশে আনা হয়েছিল, যা প্রচণ্ড তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে, আর উর্বর জমিকে অনুর্বর করে ফেলে। ল্যান্টেনা কমারা নামের এক ধরনের গাছ সৌন্দর্যায়নের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আনা হয়েছিল। আজ আমাদের দেশের প্রায় ১.৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জমিতে এই গাছ ছড়িয়ে পড়েছে। ভুল করে ল্যান্টেনা খেয়ে ফেলা একটি বাছুরকে দেখেছিলাম, চোখ বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসছে, আর ক্রমাগত জল পড়ছে।

মহিলারা গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতে এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা পরিবার, সমাজে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা আনতে পারেন। কারণ তাঁরা অনেক বেশি সচেতন। তাঁদের আবেদন সবার কাছে অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য। তাই দেশি কাছ লাগাব, যা আমাদের ফল দেয়, চারা দেয়। এমন গাছ লাগাব যা থেকে মানুষ জীবজন্তু, অন্য গাছপালা— সমগ্র বিশ্ব উপকৃত হবে। সচেতনতার সঙ্গে ধরিত্রী মা'র রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ■

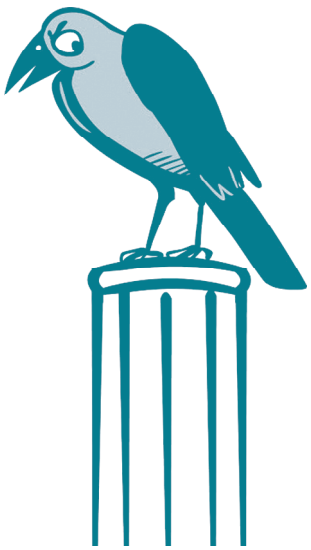

সাধ না মিটিল আশা না পুরিল

'আবোল তাবোল' স্রষ্টা সুকুমার রায়ের একটি ননসেন্স ক্লাব ছিল, যার খেয়াল-খোলা কাণ্ডকারখানা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অস্তমিত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তার বীজটি লুপ্ত হয়ে যায়নি। বটবৃক্ষের বীজের মতো সেই বীজটি অমর অঙ্কুরে নবঅবতারে হাজির, সেকুলার ননসেন্স ক্লাবরূপে। এই সেকুলার ননসেন্স ক্লাব ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিগত সত্তর বছর ধরে তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে ভারতে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টায়।

পাছে কিছু কম্যুনাল অঘটন ঘটে যায়, তাই আই-সর্বস্ব কংগ্রেসের মহানেত্রী ইন্দিরাজী হঠাৎ জরুরি অবস্থার সুযোগে একটি 'খলিফা-মেড' গণতন্ত্র উপহার দেওয়ার জন্যে সংবিধানের মূল প্রতিজ্ঞায় সেকুলার কথাটা সেঁটে দিলেন। কারণ বোধহয় তাঁর মহান পিতা নেহরুসাহেব- সহ সংবিধান প্রণেতারা বুদ্ধিতে একটু খাটো ছিলেন। তাই সেকুলার কথাটা যোগ করতে বেমালুম বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাই পিতার বুদ্ধির সংশোধনার্থে নেহরু-তনয়া এই সেকুলার কথাটি সংবিধানের মূল অঙ্গীকারের মধ্যে সংযোজন করেছিলেন। তারপর থেকে ভারতে নির্বাচনের পর নির্বাচনে যে একটিই সমস্যা আবর্তিত হচ্ছে, সেটি হলো কংগ্রেসি সেকুলারিজম বনাম বিরোধী কম্যুনালিজম। কিন্তু মুশকিল হলো, বহু ব্যবহারে জীর্ণ সেই প্যাঁচ, পৌত্র তথা 'পুতি' কংগ্রেসের জমানায় আর তেমন জনগণের কাছে খাচ্ছে না। কিন্তু বিজাতীয় ইটালিয়ান কংগ্রেসের উর্বর মস্তিষ্কে আর কোনও প্যাঁচের উদয় না হলে কীর্তনের ধুয়োর মতো সেটি অবলম্বন ছাড়া আর গতি কী!

তবে কংগ্রেসি সেকুলার সাধু ও বামপন্থী সেকুলার সতীদের যুগলবন্দিতে একটি নতুন ধারার অভ্যুদয় হয়েছে, যার নাম ইসলামিস্ট সেকুলারিজম। কেননা ভোটের বাজারে এই সেকুলারিজম খায় ভালো। সেইজন্য সেকুলার টুপি পরে ইফতার পার্টির সরকারি ব্যবস্থা, হজযাত্রীদের জন্যে সরকারি বদান্যতার বন্দোবস্ত, অ-হাজিদের জন্যে নানান ফিকিরে চিচিংফাঁকের সুযোগ করে দেওয়া, ভোটের আগে মোল্লাদের দরগায় ধরনা দেওয়া তাদের সেকুলার ব্রত হয়ে উঠেছে। এমনকী ভোটের ঠিক আগে ইমাম মোল্লাদের পদাম্বুজ গ্রহণের জন্যে সেকুলার সতী শিরোমণি ইটালিয়ান গান্ধী ও হিজাবদাসীদের মধ্যে উৎসাহের ধুম পড়ে যায়। কিন্তু হায়, সেকুলারিজম আজও দেশে অধরা, কিন্তু তাতে দমবার কিছু নেই। সর্বহারার মহান নেতা জ্যোতিবাবুর কথায়, শ্যামাদাসি কায়দায় মানুষকে বোঝাতে হবে, দরকার হলে গজাল মেরে বোঝাতে হবে।

কিন্তু মানুষগুলো এমন বেয়াড়া যে, তারা কিছুতেই বুঝতে চায় না এবং বুদ্ধিমান মানুষ ঠিক এই গোলোকধাঁধা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চায়। যেমন সম্প্রতি বিহারের নীতীশ কুমার। মহাঘোঁটবন্ধন করে বিহারে নীতীশ কুমারের সুশাসনের লেজ ধরে যাদবকুলপতি পশুপতি ও তলিয়ে-যাওয়া কংগ্রেসের অপোগণ্ড নবকুমার হালে পানি পেয়ে তড়পাচ্ছিলেন, এবার বোধহয় সেকুলার গাঁটবন্ধনে দেশে তুফান তুলে দেবেন; কিন্তু সেই নীতীশের এ কী 'বিশ্বাসঘাতক' ব্যবহার! অবশেষে সে কিনা সেই ঝাঁকের কই এনডিএ ঝাঁকে ফিরে গেল! হায় 'সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল', লম্ফঝম্পের মেয়াদ ফুরায়ে যায় মা।

সেই শোকে আমাদের সংবাদতরঙ্গ মহলে মহা মহা শূরবীরদের মধ্যে ন্যায়, নীতি, জোটধর্ম, আলোচনায় বিরোধী রাজনীতির নটেশাকটি মুড়নোর জন্যে নীতীশের সমালোচনায় মুখর। এই বাক্যবাগীশ সংবাদজীবীদের নিয়ে কোনও রহস্য নেই, এনারা হলেন ঢাকের ঢুলি ও বৈষ্ণবের খুলি। আরে রাজনৈতিক ভাষ্যকার হয়েছিস তো রাজনীতির প্রেক্ষিতের গভীরে তাকা। তবে তো কত ধানে কত চাল বোঝা যাবে! ওপরের ঢেউ দেখে সমুদ্রের গভীরের তাপাঙ্ক মাপা যায় না। একটু তলিয়ে দেখতে হয়, তবে বোঝা যায়। রাজনীতির সবচেয়ে প্রধান Pragmatic কথা হলো, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। নীতীশকুমার রাজনীতির সেই আপন প্রাণ বাঁচাতেই মহাঘোটালা বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফিরে গেছেন পুরনো জোটবন্ধনে।

ডাইনাস্টিক কংগ্রেসের ন্যাস্টি হাইকম্যান্ডের কাণ্ডজ্ঞানহীন অপরিণামদর্শিতার ফলে বিহারে

একদিনের প্রধান দল কংগ্রেসের ভরাডুবির ডামাডোলে উত্থিত যাদবকুলপতি বিহার প্রদেশকে চোর জোচ্চোর, গুণ্ডা বদমায়েশের সন্ত্রাসভূমিতে পরিণত করেছিলেন। সেখানে কোনও মানুষের নিরাপত্তা ছিল না। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে সাজাপ্রাপ্ত এই চোরচূড়ামণি, তাঁর মূর্খ স্ত্রী ও ততোধিক মূর্খ পুত্র-কন্যার দাপটে এই রাজ্যটিকে পারিবারিক লুটের পীঠস্থান করে তোলেন। সেই সন্ত্রাসী অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে নীতীশ কুমার এনডিএ জোটে বিজেপিকে সঙ্গী করে বিহারে একটি আইনের শাসন ও উন্নয়নের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করে নেতৃত্বগুণে সারা ভারতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে এনডিএকে বাদ দিয়ে বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে তাদের নেতৃত্বের মুখ করে তোলে, তখন তাতে নীতীশ কুমার অবহেলিত বোধ করে ক্ষুব্ধ হন এবং নিজের অস্তিত্বকে জানান দিতে এনডিএ ত্যাগ করে বিরোধীপক্ষে যোগদান করেন। ফলে রাজ্য নির্বাচনে জয়লাভ করতে সফল কূটনীতিতে অহি-নকুল সম্পর্কের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি যাদবজীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কিন্তু খুব ভালো করেই জানতেন, এই প্রমাণিত চোরের রাজার সঙ্গে সম্পর্ক বেশিদিনের নয়। তাই স্বভূমিতে অটল থেকে তিনি নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াসী হন।

বিহারের বিগত নির্বাচনে বিজেপির অক্লান্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে, যথার্থভাবেই বিহারী বনাম বাহারিতে, নীতীশের বিপুল জয় তাঁকে বিরোধী নেতৃত্বের মুখ করে তোলে। এবং অনেক বিজ্ঞজন, মোদীর বিপক্ষে নীতীশের বিপুল জয় তাঁকে বিরোধী নেতৃত্বে বসানোর জন্যে প্রস্তাব করেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই নীতীশের পক্ষে অতি লোভে হত লঙ্কা হওয়ার কোনও বাসনা ছিল না। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে প্রমাণিত নরেন্দ্র মোদীর দেশজোড়া জনপ্রিয়তা ও তাঁর বলিষ্ঠ এবং সাহসী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ছেঁড়া ফাটা বিরোধী জোটবন্ধনের কাছ থেকে আশা করার কিছু নেই।

সেকুলার ফ্রন্ট এখন একটা ম্যমি মূর্তির মতো। তাছাড়া যারা এই বিরোধী ফ্রন্টে আছে তার শীর্ষ কংগ্রেসি নেতৃত্বের মাথায় যেমন পরিবারতন্ত্রের একাধিক চুরি জোচ্চুরির খাঁড়া, তেমনি বিহারেও চোরতান্ত্রিক যাদব পরিবার বা তামিলনাড়ুতে আর একটি তামিল চোর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধী রাজনীতির আসর জমানো বাতুলতামাত্র। তার চেয়ে ঢের ভালো নিজের রাজ্যে সুশাসনের বার্তাটি ফিরিয়ে আনা ও কেন্দ্রীয় সাহায্যে উন্নয়নে মন দেওয়া। চোরেদের সঙ্গে থাকলে চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা হওয়ার অপবাদে যে তাঁর আমও যাবে ছালাও যাবে, সেকথা স্পষ্ট।

নীতীশের এই জোটবদলে অনেক নীতীবাগীশই মর্মাহত। তাই তাঁরা মূর্খ যাদবদের কাছে তথ্য জানতে গিয়েছেন। এনারা যদি একটু চোখ চেয়ে দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম রাজনীতিতে কার্যোদ্ধারের জন্যে কীভাবে বাঁচার জন্যে ঘোরতর শত্রুদের মধ্যে সাময়িক মৈত্রী বন্ধনের কৌশল অবলম্বন করতে বলেন। এই তো সেদিন, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে রাশিয়া হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে কিন্তু ঠেলায় পড়ে আবার হিটলারের বিরুদ্ধে অ্যাংলো আমেরিকান জোটের সঙ্গে লড়াইয়ে শামিল হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, রাজনীতিতে সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে জোটবদ্ধ হওয়াটাই যথার্থ কৌশল যোগ।

মনে হয় নীতীশের এনডিএতে ফিরে আসাতে মোদী ও নীতীশ, দুজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতার একজোট হওয়া দেশের চোর জোচ্চারের সেকুলার ফ্রন্টের হাত থেকে বাঁচতে অনেক বেশি আশার বার্তাবহ। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

নিষ্ঠা, ভক্তি, অনুধ্যান ও যুক্তির মাধ্যমে প্রেমদাস রহস্য মোচন

পুস্তক প্রসঙ্গ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

প্রেমদাস নামে বাংলায় অন্তত তিনজন কবির সংবাদ পাওয়া যায়। এদের দুজন বাঘনাপাড়া গোষ্ঠীর প্রেমদাস আর নীলজোড়ার প্রেমদাস সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন সহজিয়া সাধক। এঁদের জীবনকথা ও রচনাদির তুলনামূলক বিচার এ পর্যন্ত কেউ করেননি। বিশেষ করে বাঘনাপাড়া গোষ্ঠীর প্রেমদাস ছিলেন পারঙ্গম, সংস্কৃতজ্ঞ অথচ মুখের ভাষার প্রতি মমতাযুক্ত কনৌজি ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, সিদ্ধান্তবাগীশ। বর্ধমান জেলার মানকরের নিকট তাঁদের বাস ছিল। কিছুদিন পুরুষোত্তম বৃন্দাবনের মন্দিরে পাচক বৃত্তি করেছেন। পরে নবদ্বীপে এসে পরম বৈষ্ণব হন। জগন্নাথ, কুলচন্দ্র, মুকুন্দানন্দ, গঙ্গারাম এই ক'পুরুষের সংবাদ মিলেছে (বর্তমান গ্রন্থের ৪২ পৃ.)। পুরুষোত্তম গঙ্গারামের পুত্র।

ড. সর্বাণী চক্রবর্তী নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে অনুধ্যান ও যুক্তির মাধ্যমে প্রেমদাস রহস্য মোচন করে অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। গবেষণা গ্রন্থটি ২৭৫ পৃষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত, সঙ্গে আছে সুবিন্যস্ত গ্রন্থপঞ্জি। অন্তত বারোখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি, তিনখানি সংস্কৃত পুস্তক তিনি ব্যবহার করেছেন। বাংলা সহায়ক পুস্তকও বহু— একশো সত্তর; ইংরেজি গ্রন্থ ছয়টি আর দশটি পত্রপত্রিকা (যার অধিকাংশই সংগ্রহ করা আয়াস সাধ্য)। উপরন্তু, আট পৃষ্ঠা ব্যাপী পুরোন পুঁথির পাতার চিত্র আর তিনটি দুর্লভ বর্ণময় চিত্র উপহার দিয়েছেন গবেষক। পরিশ্রম আর তাকে রূপ দানের এমন নিবদ্ধদৃষ্টি ও পারঙ্গম গবেষক সহজে মেলে না। অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন কাননবিহারী গোস্বামীর সুযোগ্য গবেষক ড. সর্বাণী চক্রবর্তীকে শুভ কামনা জানাই। প্রাক্‌কথন পড়ে জানা গেল, শ্রীমতী চক্রবর্তী বহু গুণীজন-সান্নিধ্যে এসেছেন। অধ্যাপক ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, বিমল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়— সর্বোপরি স্বর্গগত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি গবেষণাটি করেছেন। এইসব মণিকাঞ্চন যোগে প্রেমদাস ও তাঁর ভক্তিসাহিত্য পাঠকের সামনে উঠে এসেছে।

দশটি সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে 'প্রেমদাস ও বৈষ্ণব সাহিত্য' রচিত। প্রেমদাসের লেখা অনেক; গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থাদির অনুবাদ আর তত্ত্ব ও বিষয়নির্ভর চম্পু রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল। এখন পর্যন্ত নানা সংগ্রহশালায় প্রেমদাসের যেসব পুঁথি আছে তার একটি স্বতন্ত্র তালিকা রচনা করলে কবির রসাগ্রহ আর রচনা বৈচিত্র্য একটু বোঝা যাবে। যেমন : ১. আনন্দ ভৈরব; ২. গুরুবন্দনা; ৩. গৌরাঙ্গ কড়চা; ৪. চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী; ৫.পদাবলী; ৬. মনঃ শিক্ষা; ৭. বংশীশিক্ষা। ড. সর্বাণী চক্রবর্তী এর সবগুলি দেখেছেন কিনা জানি না— তিনি কিছু ছাপা বই আর অপ্রকাশিত পুঁথি দেখে এই রচনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। যথা : ১. চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী; ২. মনঃ শিক্ষা; ৩. রঘুনাথ দাসের সূচক; ৪. চন্দ্রচিন্তামণি।

ড. চক্রবর্তীর বিচারে এই রচনাগুলি সহজিয়া প্রেমদাসের লেখা, যেমন : ১. ভৃঙ্গরত্নাবলী; ২. রসোল্লাসতত্ত্ব; ৩. গৌরাঙ্গ কড়চা; ও নিত্যানন্দ কড়চা; ৪. আনন্দ ভৈরব।

অর্থাৎ তিনি পরিক্রমাবৃত, গুরুবন্দনা, বৃন্দাবনবিলাস সাধনরসতত্ত্ব, মুক্তাচরিত, রসতত্ত্ব, সন্ন্যাস প্রভৃতি পুঁথিকে গুরুত্বহীন ভেবেছেন। কবি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছুদিন বৃন্দাবনে বসবাস করেছেন। ফলে তাঁর সংশ্লিষ্ট রচনাগুলিকে গুরুত্ব দিলে সুফল পাওয়া সম্ভব ছিল বলে মনে করি।

বাংলার ভক্তিসাহিত্যে প্রেমদাসের স্থান নির্ণয়ের জন্য লেখিকার নিষ্ঠা ও পরিশ্রম বৃথা যাবে না বলে বিশ্বাস রাখি। তাঁর সিদ্ধান্ত রসানুগত, যথার্থ নিরাবেগ। যেমন 'সুন্দরি তুমি আমার পরাণের পরাণি'— শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদনের এই পদ তাঁর মতে 'ভাব ও চিত্রকল্প চণ্ডীদাসের... ছায়ায় রচিত।' (১৬৮ পৃ.); নিমাইসন্ন্যাস, শচীমাতা-বিষ্ণুপ্রিয়ার খেদ, নবদ্বীপবাসীর ব্যাকুলতা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর পদের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল, মধুর, প্রাণগলানো বাংলা'।

মধ্যযুগের অনুবাদ এক অর্থে ভাষান্তর ঠিকই। তবে, এসবই প্রায় সাংস্কৃতিক অনুবাদ (cultural transformation)। ভাগবত থেকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', রামায়ণ থেকে 'কৃত্তিবাসের রামপাঁচালী', মহাভারত থেকে কাশীরামদাসের 'ভারত পাঁচালী'— সমান্তরাল বা প্রতিবিম্ব ভাষান্তর নয়— বাঙালি মনের অনুগত, বেদ-উপনিষদ-পুরাণ বাহিত জীবন-নীতি-ধর্মাচারের অনুসরণ। বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থাদির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর রচনা, শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পাঠ্য বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' বাংলার সাধারণ অল্পশিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণবদের উপযুক্ত করার প্রয়াসে বহু অনুবাদ হয়েছিল। এই কাজে যদুনন্দন দাস-রসময় দাস-লোচন দাস-নরোত্তম-নরহরি চক্রবর্তীর পাশে প্রেমদাসও পারঙ্গম আগ্রহ দেখিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-এর অনুসরণে প্রেমদাস লিখেছেন 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী'। 'ঐতিহাসিক ও জনজীবন সম্পৃক্ত' চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রেমদাস 'মূলাতিরিক্ত' সংযোজন করেছেন, কিছু ক্ষেত্রে 'আক্ষরিক অনুবাদ করেননি' (৭৪ ও ৭৫ পৃ. যথাক্রমে)। এই সব মূল্যায়ন শ্রীমতী সর্বাণী চক্রবর্তীকে নিষ্ঠাবতী গবেষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

আশা করব অধিকাংশ গবেষকের মতো শ্রীমতী চক্রবর্তী থেমে না গিয়ে আরো নতুন নতুন বিষয় সন্ধান—বিন্যাস ও উপস্থাপন করবেন। বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যের ভক্তিধর্মের বিস্তৃত ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আরও অনেক সক্ষম সনিষ্ঠ গবেষণা হওয়া চাই। আজকের ভোগবাদী তাৎক্ষণিক উত্তেজনাকর উষ্ণ হাতে গরম গণমাধ্যমে ক্লান্ত হলে তরুণ-সমাজ বাহুড়া-যাত্রা বা ঘরে ফেরার উল্টো রথে চেপে বসবে বলে বিশ্বাস রাখি। তাই আমাদের এই রকম পরিশীলিত গবেষকদের আরও বেশি করে সন্নিবেশ ঘটা চাই। বইটির ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

প্রেমদাস ও বৈষ্ণব সাহিত্য : ড. সর্বাণী চক্রবর্তী, প্রকাশক : তপন চট্টোপাধ্যায় (বড়দা), দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা। বইমেলা ২০১৭। মূল্য : ১৫০ টাকা।

অন্য রকম

পূর্ণিমা মাহাতো

গ্রামীণ ঝাড়খণ্ডের নিঃশব্দ বিপ্লবের মুখ

নিজেস্ব প্রতিনিধি॥ ঝাড়খণ্ড বলতে সাধারণভাবে পিচমোড়া রাস্তার দু’ ধারে ঘন-গভীর অরণ্যের ছবি ভেসে ওঠে। আবার এই শান্ত শ্যামলিমার আনাচেকানাচে রয়েছে মাইন-গ্রেনেড-এ কে ফরটি সেভেন হাতে মাওবাদীরাও। দীর্ঘদিন ধরে এই বৈপরীত্যকে বহন করে চলেছে ঝাড়খণ্ড।

কিন্তু সময় বাঁক নিয়েছে ২০১৪-র পর। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াসে ঝাড়খণ্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তার উজ্জ্বল উদাহরণ পূর্ণিমা মাহাতো। মাওবাদী উন্মত্ততা পরিবর্তনের প্রয়াসকে কিংবা পূর্ণিমার কিছু হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

একটা সময় ছিল যখন পূর্ণিমাকে তার নিজের তৈরি পাপড় আর আচার বিক্রি করার জন্য মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে হোত। এখন পূর্ণিমা পাপড় এবং আচারের বিপণন থেকে শুরু করে ক্রেতাদের কাছ থেকে পেমেন্ট নেওয়া পর্যন্ত— প্রতিটি কাজ নিজের স্মার্টফোনের সাহায্যে করে থাকেন।

যারা শহরে থাকেন তারা হয়তো বলবেন, এর মধ্যে কী আর নতুনত্ব আছে! কিন্তু তারা যদি জানতে পারেন পূর্ণিমার মতো যাঁরা ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন সার্থক করে তুলেছেন, তাঁদের কেউই স্কুলের শিক্ষাটুকু শেষ করেননি তাহলে অবশ্যই নতুনত্ব খুঁজে পাবেন।

বিপণনের কাজে পূর্ণিমা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন। পেমেন্টও আসে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। শুধু ক্রেতার কাছে মাল পৌঁছে দেবার কাজটা কাউকে করতে হয়।

ঝাড়খণ্ডের এই নিঃশব্দ বিপ্লবের পিছনে রয়েছে ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগ। গ্রামে-গ্রামে কাজ করা বিভিন্ন সেলফ্ হেলফ্ গ্রুপের মহিলাদের মধ্যে যারা স্বনির্ভর হতে চান তাদের প্রত্যেককে বিনামূল্যে স্মার্টফোন দিয়েছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। চার সন্তানের মা পূর্ণিমা সুযোগটি হাতছাড়া করেননি। বস্তুত তিনি এবং তাঁর মতো আরও কয়েকজন সরকারের দেওয়া এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে গ্রামীণ উদ্যোগপতি হয়ে উঠেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার স্মার্টফোন বিলি করার কাজ শুরু করেছিল নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল ইকোনমি প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে। ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নীলকান্ত সিংহ মুণ্ডা বলেন, ‘এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহ দেওয়া। যাতে কম নগদের অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়। তবে আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে স্মার্টফোনের উপযোগিতা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। তিনি আরও বলেন, ‘আগামী দু’মাসের মধ্যে এক লক্ষ স্মার্ট ফোন ফ্রি নেটওয়ার্ক-সহ বিলি করা হবে। ২০১৯ সাল নাগাদ সেলফ্ হেলফ্ গ্রুপগুলিকে আরও এক লক্ষ স্মার্টফোন দিতে পারব বলে আশা করছি।’

ব্যবসা ক্রমশ বাড়তে থাকায় পূর্ণিমা খুব খুশি। আগে যা রোজগার করতেন এখন তা অনেকটাই বেড়েছে। সব থেকে বড়ো কথা অভাবের সংসারে সামান্য হলেও সচ্ছলতা এসেছে। প্রশংসা শুনলে পূর্ণিমা লজ্জা পান। কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলেন, ‘সরকার যদি এভাবে পাশে দাঁড়ায় তাহলে আমার মতো অনেক মেয়ে উপকৃত হবে।’

কথাটা ঠিক। তবে এর পাশাপাশি আর একটা কথাও বলা দরকার। সারা বিশ্বে যেখানে ৫০ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, ভারতে সেখানে সংখ্যাটা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩৫ শতাংশ। এর জন্য শুধুমাত্র ডিজিটাল পরিকাঠামোর অভাবকে দায়ী করলে চলবে না। মেয়েদের প্রতি বৈষম্যও এর একটা প্রধান কারণ। বিশেষ করে ভারতের গ্রামেগঞ্জে। ভারতে ১৯.১ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করেন। এর মাত্র ২৪ শতাংশ মহিলা। যাইহোক, এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যে পূর্ণিমা মাহাতোরা উঠে আসছেন সেটা একটা বড়ো পাওনা। এর জন্য মোদী সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির প্রশংসা করতেই হবে। ■

মিতালিদের হারও একটি মাইলফলক

দীপ চক্রবর্তী

ইংরেজিতে চোকার্স বলে একটা কথা আছে। চোকার্স বলতে সেই হতভাগ্যদের বোঝায় যারা চাপের মুখে সহজেই ভেঙে পড়ে। এবারের মেয়েদের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের পারফরম্যান্স নিয়ে দেশজুড়ে প্রশংসার বন্যা বয়ে গেলেও আড়ালে এ কথাও কেউ কেউ বলছেন একমাত্র ভারতের পক্ষেই চাপের মুখে এভাবে ভেঙে পড়া সম্ভব।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, ভারত এই প্রথম চাপের মুখে ভেঙে পড়ছে না। এর আগে বহুবার ভারতের ছেলেরা জেতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেও স্রেফ চাপ সহ্য করতে না পেরে হেরে গেছে। এতৎসত্ত্বেও আমরা কিন্তু তাদের তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্বকে খাটো করে দেখি না। বরং তাদের সাফল্যে সারা দেশ গর্বিত হয়। তাহলে মেয়েদের বেলায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই সংকীর্ণতা কেন?

ভারতীয় ক্রিকেটের বাঁকবদলের শুরু ১৯৮৩ সালে। সে বছর ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম বিশ্বকাপ জেতে। এর আগে ভারতীয় দল দেশেবিদেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে টেস্টম্যাচ বা সিরিজ জিতেছে। কিন্তু চাপের মুখে ভেঙে পড়ার ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি। কারণ চাপ তখন ছিলই না। এমনকী ১৯৮৩ সালেও ভারতীয় দলের কাছে কেউ কিছু প্রত্যাশা করেননি। বিশেষ করে একশো তিরাশি রানে অলআউট হয়ে যাবার পর আশা করার সাহসও খুব বেশি মানুষের ছিল না। চাপমুক্ত মনে খেলার জন্যই সেদিন ভারত জিতেছিল। নচেৎ সেই সময়কার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর মতো ব্যাটিং বা বোলিং কিছুই ভারতের ছিল না।

চাপটা তৈরি হলো ১৯৮৩-র পর। আমরা সবাই অন্ধের মতো বিশ্বাস করে ফেললাম যে-কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হবার ক্ষমতা ভারতের আছে। পাহাড়প্রমাণ চাপ তৈরি হলো ক্রিকেটারদের ওপর। যার নিট ফল ক্রমাগত হার। আশির দশকে ভারত প্রত্যেক বছর শারজায় যেত এবং নিয়ম করে পাকিস্তানের কাছে হারত। ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তানের আগ্রাসন এবং দেশের মানুষের অনন্ত প্রত্যাশার চাপে কত জেতা ম্যাচ যে ভারতের হাতছাড়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালও ভারত চাপ নিতে না পারার কারণে হেরেছিল। একে বিশ্বকাপের ফাইনাল, তার ওপর অস্ট্রেলিয়ার বিশাল স্কোর, সর্বোপরি সারা দেশের উন্মুখ অপেক্ষা— ফল, ভারতের ব্যাটিংয়ে অপ্রত্যাশিত ধস।

সুতরাং, মিতালিদের হারও এক হিসেবে নতুন মাইলফলক। কারণ যতক্ষণ ওদের কেউ ধর্তব্যের মধ্যে ধরেনি ততক্ষণ ওরা জিতছিল। যে মুহূর্তে প্রত্যাশার পারদ চড়তে শুরু করল ওরা হেরে গেল। এ যেন ১৯৮৩-র পুনরাবৃত্তি! পার্থক্য শুধু একটাই সেবার ছেলেরা জিতেছিল। কিন্তু এবছর মেয়েরা রানার আপ হয়েই বিদায় নিয়েছে। আশা করা যায় ছেলেরা যেমন চাপের মুখে ভেঙে পড়তে পড়তে চাপ এড়িয়ে যেতে শিখেছে, মেয়েরাও একদিন তেমন করে দেখাবে। নিখাদ গর্বে ভরে যাবে ভারতবর্ষের মন। ভারতের মহিলা দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ বলেছেন, মেয়েদের ক্রিকেটের সুদিন এসে গেছে। কথাটা ঠিক। কিন্তু এই সুদিনকে দীর্ঘস্থায়ী করার দায়িত্ব কিন্তু মিতালিদেরই। ছেলেরা কাজটা সুন্দরভাবে করতে পেরেছে, মেয়েদেরও পারতে হবে। ■

রবিবারের স্কুল

দোকানের সামনে একটি ছেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। মুদির দোকান। খদ্দেরের আনাগোনা। যার যা চাই কিনে নিয়ে বেরিয়ে যচ্ছে। কেবল ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের মালিক ক্যাশ বাক্সের সামনে বসে খদ্দেরের কাছ থেকে

জিনিসের দামপত্তর নিচ্ছে। দোকানে তিনজন কর্মচারী। সবচেয়ে ছোট কর্মচারীটির বয়স দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির মতো। জিনিসপত্র দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে ছেলেটির কাছে এসে গল্প করছে। ছোট ছেলেটি কর্মচারী-ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করছে— তুমি ফুটবল খেলা দেখ না?

—আগে তো দেখতাম, যখন বাড়িতে থাকতাম।

—এখন দেখ না কেন?

—এখানে কোথায় খেলা হয় জানি না যে।

—ওই তো, ক্লাবের মাঠে রোজ বিকেলে খেলা হয়। এস না একদিন।

—কাল রোববার আমার তো ছুটি, কাল যাবো।

দোকানের মালিক চিৎকার করে হাঁক দিল— ন্যাপলা মালগুলো নামা।

—তোমার নাম ন্যাপলা?

—না, আমার নাম নেপাল চন্দ্র দাস।

—তাহলে তোমার মালিক ন্যাপলা বলে ডাকে কেন?

—এখানে সবাই তাই ডাকে। যাই, মালিক রেগে যাবে।

এই বলে কর্মচারী-ছেলেটি দৌড়ে চলে গেল মাল নামাতে।

পরেরদিন ছেলেটি আবার সেই দোকানের সমানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কর্মচারী-ছেলেটির হাতে আজ সময় নেই। দোকানে খদ্দেরের ভিড়। মালিক মাঝে মাঝেই ন্যাপলার নাম ধরে ডাকছে।

তারই এক ফাঁকে কর্মচারী-ছেলেটি ছোট ছেলেটির সামনে এসে দাঁড়াল।

ছেলেটি বলল— রবিবার বিকেলে তুমি এলে না যে? আমরা কত খেললাম।

—সেদিন আমাদের দোকান সাফ হলো, কী করে যাই?

—পরের রবিবারের আসবে তো?

—দেখি, কোনো কাজ না থাকলে যাবো।

মালিক ন্যাপনাকে ছেলেটির সঙ্গে গল্প করতে দেখে বলল— খোকা তোমার কী চাই? ছেলেটি বলল— কিছু না, এমনি।

—তাহলে এখন বাড়ি যাও।

তার পরেরদিন ছোট ছেলেটি ও কর্মচারী-ছেলেটি বিকেলবেলা ক্লাবের মাঠ থেকে ফিরছে।

কর্মচারী ছেলেটি আজ একটি ভালো জামা পরেছে। দোকানে থাকলে ও একটি ময়লা হাফ প্যান্ট আর একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থেকে। আজ তার ভারী আনন্দ। অনেকদিন পর ফুটবল খেলা দেখল।ছেলেটি বলল— তুমি কোনোদিন স্কুলে যাওনি?

—যেতাম তো। গ্রামের স্কুলে আমি ক্লাস ফোরে পড়তাম।

—তাহলে এখন যাও না কেন?

—কী করে যাবো, এখন যে আমি কাজ করি।

—ইচ্ছে করে না স্কুলে যেতে?

—করে তো।

—তোমার মালিক তোমাকে যেতে দেয় না?

—যারা কাজ করে তারা স্কুলে যায় নাকি? আজ আসি, দেরি হলে মালিক পিঠের ছাল তুলে নেবে।

তার পরেরদিন ছেলেটি রাস্তায়

উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগের দিন মালিক ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তার দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে গল্প করা যাবে না। তাই ছেলেটি নজর রাখছে কখন দোকান খালি হয়। ফাঁকা হলেই সে নেপালকে খবরটা দিয়ে আসবে।

একটু অপেক্ষার পর মালিককে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো সে। দেরি না করে ছেলেটি চলে গেল দোকানে নেপালের কাছে।

নেপাল—তুমি ওপারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো যে?

—তোমার মালিক আমার আসা পছন্দ করে না, তাই।

—আমার মালিক ভালো লোক নয়।

—কাল রবিবার, তুমি বিকেলে আসতে পারবে? এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

—কখন?

—পাঁচটার সময়।

—ওই সময় আমি তেল আনতে বড় দোকানে যাই। সেই ফাঁকে চলে যাবো।

—এস কিন্তু। দেরি করো না।

পরদিন বিকেল পাঁচটায় দু-জনে খেলার মাঠে হাজির। কিন্তু আজ তারা খেলবে না। অন্য কোথাও যাবে।

নেপাল—তুমি বললে না তো আমরা কোথায় যাবো। আমার হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।

—তুমি সেদিন বললে যে তোমার পড়তে ইচ্ছে হয়। তাই পড়ার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

—স্কুলে?

—হ্যাঁ।

—আমি স্কুলে পড়লে কাজ কে করবে! মালিক শুনলে পিঠের ছাল তুলে নেবে।

—এখানে তুমি কাজ করতে করতে পড়তে পারবে। মালিক তবু যদি না মানে স্কুলের স্যার গিয়ে বুঝিয়ে আসবে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুজন একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সামনে একটি বড় সাইনবোর্ড লাগানো। নেপালের অক্ষর জ্ঞান আছে। সাইনবোর্ডের লেখাগুলি সে বানান করে পড়লো— র-বি-বা-রে-র-স্কু-ল।

ভালো কথা

বিড়াল ছানা হাবুডুবু

কদিনের টানা বৃষ্টিতে চারিদিকে জল। পুকুর, ডোবা সব জলে ভরে গেছে। কোথাও কোথাও রাস্তাতেও জল জমে আছে। গত রবিবার ছুটির দিন হওয়াতে আমি ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি জল দেখতে। কিছুদূর গিয়ে দেখি একটি বিড়াল ছানা ডোবার জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। সাঁতরে পাড়ে ওঠার চেষ্টা করছে পারছে না। আমি তখন আমার ছাতা বন্ধ করে এগিয়ে দিলাম, বিড়ালছানাটি ডাঙায় উঠে এলো। উঠে এসে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে পালিয়ে গেল।

সূর্য কর্মকার, সিউড়ি, বীরভূম।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) না ত ধ ন্ত্র	(১) ক না পা চু রি
(২) রা র্গ ব জ	(২) ন ং ধ স শো

১৭ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) শরণাগত (২) দীনদয়াল

১৭ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) ইলশেগুড়ি (২) গ্রন্থাগারিক

উত্তরদাতার নাম

(১) আলাপন দলুই, হলদিয়া পূর্ব মেদিনীপুর। (২) রূপসা দেবনাথ, বিরাটী, কলকাতা-৫৯ (৩) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (৪) পুষ্কর সরকার, বালুরঘাট।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৩৫

শব্দরূপ-৮৩৮ শ্যামাপ্রসাদ দাশ

■	■	১		২		■	৩
৪			■		■	■	
	■		■	৫	৬		
৭			■	৮		■	■
■	■	৯	১০	■	১১		১২
১৩				■	১৪	■	
	■	■		■			
১৫						■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. 'হাজার চুরাশির মা' গ্রন্থটির লেখক, ৪. ধোপা, সংস্কৃত সাহিত্যের কবি, ৫. রঙ্গালয়ে নট-নটীদের সাজসজ্জার স্থান, ৭. ছিলিম, হলদে ফুল, ৮. গুজব, ৯. পর্বতের উপরের সমতলভূমি, ১১. বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ধনায়িকা, ১৩. রান্নাঘর, ১৪. জলযান সমূহ, ১৫. '— কত', 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়'।

উপর-নীচ : ১. কন্দর্পদেব, ২. পালো, ৩. বানানভেদে উত্তর আমেরিকার উভয়চর জন্তু, ৪. মন্ত্রপাঠ করানোর বৃত্তি অবলম্বনকারী, ৬. 'ভূতের রাজা দিল বর—', ১০. রসে পরিপূর্ণতার ভাব, ১২. বরফের প্রতিশব্দ, ১৩. মহাদেব।

সমাধান : শব্দরূপ-৮৩৫

■	তা	প	স	■	নি	গ	ম
■	রা	■	ত্য	■	ক	■	ন
কু	■	■	জি	গী	ষা	■	সা
মা	র	জি	ৎ	■	■	■	ম
র	■	■	■	চ	তু	র	ঙ্গ
স	■	জ	ম্বু	ক	■	■	ল
ম্ভ	■	বা	■	ম	■	অ	■
ব	গ	লা	■	কি	ন্ন	র	■

সঠিক উত্তরদাতা

সঞ্জয় পাল, সাহাপুর, মালদা
সুশীল কয়াল, তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া

□ ৮৩৮ সংখ্যার সমাধান পরের সংখ্যায়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
7 August - 2017 - Rs. 10.00,

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W
MRP
₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।